হীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

দিশারী

২০১৬—১৭ শিক্ষাবর্ষ

নলহাটি, বীরভূম

হীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

দিশারী

পত্রিকা উপসমিতি

[illegible]

[illegible]

প্রধান সম্পাদক

[illegible]

[illegible]

সহযোগী সম্পাদক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি, বীরভূম

পরিচালন সমিতি

শ্রী বিপ্লব ওঝা	:	সভাপতি, পরিচালন সমিতি
অধ্যাপক দেবব্রত সাহা	:	ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং সম্পাদক, পরিচালন সমিতি
অধ্যাপক অমিয় কুমার দত্ত	:	সরকারের প্রতিনিধি, রামপুরহাট কলেজ
অধ্যাপক অসীম কুমার পাল	:	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, রামপুরহাট কলেজ
অধ্যাপক উত্তম মণ্ডল	:	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়
শ্রীমতী করুণাময়ী ব্যানার্জি	:	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, আসুলেহা গার্লস কলেজ
ড. মণিশঙ্কর অধিকারী	:	শিক্ষক প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জি	:	শিক্ষক প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
অধ্যাপক সৈয়দ এম. জামান	:	শিক্ষক প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
শ্রী সুভাষ ভৌমিক	:	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
শ্রী অসীম কুমার ভড়	:	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
মহ: বাসিরুদ্দিন	:	সাধারণ সম্পাদক ছাত্র-সংসদ, হীরালাল ভকত কলেজ

বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক—শ্রী দেবব্রত সাহা

বাণিজ্য বিভাগ :

ড. রঞ্জিত কুমার সরকার, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি এবং বিভাগীয় প্রধান।
অধ্যাপক বিমল পাল, সহযোগী অধ্যাপক।
অধ্যাপক সলিল কুমার সেনগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক।
ড. বংশীধর সান্থ, সহকারী অধ্যাপক, অংক
শ্রী সুখেন কুমার মণ্ডল, অংশকালীন অধ্যাপক।
শ্রী গৌতম কুমার মণ্ডল, অংশকালীন অধ্যাপক।

বাংলা বিভাগ :

ড. চৈতন্য বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক, এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাতর্বিভাগ।
ড. মণিশঙ্কর অধিকারী, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান
অধ্যাপিকা পিঙ্কি দাস, সহকারী অধ্যাপিকা।

ইংরেজি বিভাগ :

অধ্যাপক গৌতম সেন, সহকারী অধ্যাপক।
অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।
অধ্যাপিকা সুদীপ্তা সিংহ, সহকারী অধ্যাপক।
অধ্যাপক আব্দুর রেকিব, অতিথি অধ্যাপক।

ইতিহাস বিভাগ :

অধ্যাপক সুকুমার মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক।
অধ্যাপিকা অমৃতা বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপিকা এবং বিভাগীয় প্রধান।
একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদ শূন্য।
শ্রী নেকশাদ খান, অতিথি অধ্যাপক।
শ্রী বাবর আলি, অতিথি অধ্যাপক।
শ্রী কাজেম মণ্ডল, অধ্যাপক, প্রাতর্বিভাগ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ :

অধ্যাপক সৈয়দ এম. জামান, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।

অধ্যাপক বিমান সাহা, সহকারী অধ্যাপক।

শ্রী নীলমণি মুখোপাধ্যায়, অংশকালীন অধ্যাপক।

তনুশ্রী সিন্‌হা, অংশকালীন অধ্যাপিকা (প্রাতর্বিভাগ)।

শ্রী অনন্ত মণ্ডল, অতিথি অধ্যাপক।

দর্শন বিভাগ :

অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।

অধ্যাপক স্বপন সাহা, সহকারী অধ্যাপক।

শ্রী রণজয় খান, অংশকালীন অধ্যাপক।

তনুশ্রী দাস, অংশকালীন অধ্যাপিকা।

শ্রীমতী মৌমিতা ব্যানার্জি, অতিথি অধ্যাপিকা, প্রাতর্বিভাগ।

শ্রী নাজমুল হাসান, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী অরুণাভ দাস, অতিথি অধ্যাপক।

সংস্কৃত বিভাগ :

অধ্যাপিকা অয়ন্তিকা সরকার, সহকারী অধ্যাপিকা, এবং বিভাগীয় প্রধান।

সুনন্দা বিষ্ণু, অতিথি অধ্যাপিকা।

শ্রী প্রীতম রুজ, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী অতনু ভট্টাচার্য, অতিথি অধ্যাপক।

পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ :

অধ্যাপক কৃতীমান বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান

শ্রীমতী তাপসী মুখোপাধ্যায়, অংশকালীন অধ্যাপিকা।

ভূগোল বিভাগ :

অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।

শ্রী নীলাদ্রি দাস, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী শুভাশিস সূত্রধর, অতিথি অধ্যাপক।

শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল, অতিথি অধ্যাপক।

শরীরবিদ্যা বিভাগ :

শ্রীমতী সুমনা ঘোষ, অতিথি অধ্যাপিকা।

শ্রী বর্ষণ ঘোষ, অতিথি অধ্যাপক।

উর্দু বিভাগ :

ড. বাবুল আলম, অতিথি অধ্যাপক।

অর্থনীতি বিভাগ :

একজন পূর্ণসময়ের শিক্ষক পদ শূন্য।

গ্রন্থাগারিক :

শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষা সহায়ক কর্মীবৃন্দ

শ্রী ধনপতি মণ্ডল, প্রধান করণিক।

শ্রী সুভাষ ভৌমিক, হিসাব রক্ষক।

শ্রী অসীম কুমার ভড়, ক্যাসিয়ার।

শ্রী মলয় মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার করণিক।

শ্রী ইন্দ্রজিৎ কুমার সাও, টাইপিষ্ট ক্লার্ক।

শ্রী শিশির দাস, করণিক।

শ্রী হুমায়ুন কবীর, ইলেকট্রিসিয়ান।

শ্রী পিন্টু কুমার মল্লিক, করণিক।

শ্রী বিপ্লব কুমার মারাণ্ডি, করণিক।

শ্রী আব্দুল বাসির, অফিস বেয়ারার।

শ্রী পরেশ কুমার পাল, দারোয়ান।

শ্রী কৃষ্ণগোপাল লাহা, অফিস বেয়ারার।

শ্রীমতী কৃষ্ণা নাথ, লেডি অ্যাটেন্ড্যান্ট।

শ্রী গণেশ প্রসাদ সাহানী, জেনারেটার অপারেটার।

শ্রী চন্দ্রশেখর লেট, লাইব্রেরী অ্যাটেন্ড্যান্ট।

শ্রী গোবিন্দ ফুলমালী, ল্যাব আটেন্ড্যান্ট

শ্রী নিখিল কুমার ফুলমালী, অংশকালীন সুইপার।

শ্রী তকবীর সেখ, অংশকালীন সুইপার।

শ্রী রমেশ মাল, অংশকালীন গার্ড।

হীরালাল ভকত কলেজ ছাত্র-সংসদ—২০১৬-১৭

সভাপতি : শ্রী দেবব্রত সাহা, অধ্যাপক
হীরালাল ভকত কলেজ

সহ-সভাপতি : শ্রী চন্দন দাস

সাধারণ সম্পাদক (জি.এস.) : মহ: রফিকুদ্দিন

সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এ.জি.এস.) : রাজু শেখ

সাংস্কৃতিক সম্পাদক : মহ. কামাল হাসান

আউট-ডোর ক্রীড়া-সম্পাদক : সাগর দাস

ইন-ডোর ক্রীড়া সম্পাদক : হাসান বসু

সাধারণ ক্রীড়া সম্পাদক : রিয়াজুদ্দিন শেখ

পত্রিকা সম্পাদক : উজির প্রসাদ

দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদক : মজিদ শেখ

ছাত্রদের কমন-রুম সম্পাদক : চাঁদ মন্ডল

ছাত্রীদের কমন-রুম সম্পাদিকা : হাসেনা খাতুন

বুক-ব্যাঙ্ক সম্পাদক : আলী হোসেন

এন.সি.সি. সম্পাদক : সুধীর প্রসাদ

এন.এস.এস. সম্পাদক : শেখ সাহাবুদ্দিন

ক্যান্টিন সম্পাদক : জাহেদুর শেখ

গ্রন্থাগার সম্পাদক : মেহেবুব শেখ

গ্রাউণ্ড সম্পাদক : মারুফ সিরাজিম

জিম সম্পাদক : হারেক মিয়া

সভাপতির প্রতিবেদন

হীরালাল ভকত কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা 'দিশারী'র প্রকাশ ঘটতে চলেছে শুনে খুশী হ'লাম। কলেজের নিয়মিত অনুষ্ঠানের একটি হল পত্রিকা প্রকাশ। এ কলেজে সেটা যে নিয়মিতই হয়, তা' বলতে দ্বিধা নেই। যাঁদের উদ্যোগে পত্রিকা প্রকাশের কাজটি মসৃণভাবে সুসম্পন্ন হয়, সেই শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থী সকলকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। পত্রিকার মান কতটা উন্নত হ'তে পেরেছে, সেটা এক্ষুনি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে আশা করব, সম্পাদক ড. চৈতন্য বিশ্বাসের সংমার্জনায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাগুলি অপাংক্তেয় হবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দেবার জন্য কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও পত্রিকায় লেখা দিয়ে থাকেন। তাতেই পত্রিকার মান বাড়ে। উৎসাহী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু অনেকেই লেখক হ'তে অনিচ্ছুক। যদি হাজার তিনেক রচনা প্রকাশের জন্য সম্পাদকের কাছে জমা পড়তো, তাহলে নির্বাচন ক'রে রচনা প্রকাশ করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো। ছাত্র-ছাত্রীদের রচনায় ভুল বানান, ভুল কাব্যভাষা, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদিতে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক; তবু সম্পাদকের হাতের ছোঁয়ায় ত্রুটিমুক্ত একটি পত্রিকা আমরা হাতে পাই।

দিবা বিভাগ এবং প্রাতর্বিভাগ মিলে বহু ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজে পড়াশোনা করে। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্র-সংসদের সচেতনতার কারণে এখানে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। পড়াশোনার পরিবেশও বজায় থাকে। যত ছেলে-মেয়ে ভর্তি হয়, ক্লাসে বসে তার অনেক কম। আমাদের নানা রকম চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের ক্লাসমুখী করা যায় নি। এবার থেকে সেমেস্টার সিস্টেমে পড়াশোনা শুরু হয়েছে। এতে ২০ শতাংশ নম্বর আছে কলেজের হাতে। ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্যও নম্বর আছে। তাই, এ বছর ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার একটু বেশী।

প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নবীনবরণ উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব ইত্যাদিতে উপস্থিত থাকার কারণে আমি লক্ষ্য করি, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি এবং ভূমিকা সন্তোষজনক। বিশেষত, এন.সি.সি. এবং এন.এস.এসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। এন.এস.এসের উদ্যোগে রক্তদানের গুরুত্ব ও রক্ত ঘটিত নানান রোগের উপর আলোচনা সভা হয়ে গেল। এদেরই উদ্যোগে রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান করা হয় প্রতি বছর। গত বছর ন্যাক পরিদর্শন উপলক্ষ্যে এন.এস.এস. ও 'পরিবেশ বিদ্যা' বিভাগের উদ্যোগে নানা ধরণের গাছ-পালায় কলেজটিকে সাজানো হয়েছিল। সেই সজ্জা ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতার জন্যই আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এ জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

সরকারি অর্থসাহায্যে এ বছর কলেজের উন্নয়নে দু'টি নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে, এক. জিমের ব্যবস্থা, দুই. খোলা মঞ্চ। ছাত্র-ছাত্রীদের বহুকালের প্রত্যাশা এবারে পূরণ হয়েছে। মঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন খুব শীঘ্রই। মঞ্চটি তৈরী হওয়ায় নবীন বরণে, সোসাল ফ্যাংশান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ তৈরী করতে আর খরচ করতে হবে না। বাঁশ-কাঠের হাঙ্গামাও থাকবে না। কলেজের সৌন্দর্য বজায় থাকবে।

এ বছর বিভিন্ন বিষয়ের পাঁচ জন পূর্ণসময়ের ও চার জন অতিথি শিক্ষকের আগমনে পঠন-পাঠনের যে যথেষ্ট উন্নতি এবং প্রসারণ ঘটবে, তা' আশা করতেই পারি। কয়েকটি বিষয়ে, পূর্ণসময়ের শিক্ষক ছিলেন না; এবার সে অভাব ঘুচে গেল। কলেজের স্বস্তি এবং গৌরব বাড়লো। আরো কিছু শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে; আশা করবো, সেই পদগুলোও খুব শীঘ্রই পূরণ হয়ে যাবে।

সবশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আবেদন করবো, যে উদ্দেশ্যে তারা কজেজে ভর্তি হয়, যা পাবার জন্য তারা কলেজে আসে, তা বেশি ক'রে পাবার জন্য যা যা করা উচিত, তা যেন মন দিয়ে করে। ক্লাসে উপস্থিত থাকে

পড়াশোনায় মন দেয় এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার চেষ্টা করে। মনে রাখতে হবে, এই ফলটার জন্যই সকল উদ্যোগ! এটা খারাপ হ'লে সবই ব্যর্থ। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফল, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা পাওয়া, সমৃদ্ধ হওয়া—এর মধ্যেই রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা। আমি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে সেই সার্থকতাই কামনা করি। সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রইল আমার আশীর্বাদ। শুভেচ্ছা রইল কলেজের পরিচালন সমিতির সকল সদস্য, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীদের জন্য। কলেজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

তাং-৩০.০৮.১৭
নলহাটি বীরভূম

বিপ্লব কুমার ওঝা
সভাপতি
পরিচালন সমিতি,
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি বীরভূম।

হীরালাল ভকত কলেজ, বিদ্যাসাগরের মূর্তি

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের প্রতিবেদন

"অসতো মা সদগময়ঃ
তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ
মৃত্যোর্মা অমৃতাং গময়ো"

হে পরমাত্মা, অসৎ থেকে সৎ-এর পথে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে বিচরণ করাও, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানই ধর্ম, সেই জ্ঞানের বিচ্ছুরণ মানব হৃদয়ের অন্দরমহলে ঘটে যাওয়া সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশ। সাহিত্য বিজ্ঞানের গবেষণাগারের ন্যায় অণু-পরমাণুর বিশ্লেষণ করেনা ঠিকই বা তাদের গাণিতিক বিশ্লেষণে নতুন তথ্য অনুসন্ধান করে না ঠিকই, কিন্তু মানব গবেষণাগার মনের অন্দরমহলে সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-নিরানন্দের বিশ্লেষণে যে অনুভূতির জন্ম হয় তা বিজ্ঞানের ঘরে মেলে না, তা' সাহিত্যিকের হৃদয়ের ক্যানভাস থেকে উঠে আসা অনুভূতির ফসল, যা মানব জমিনের শ্রেষ্ঠ উপহার। এই অনুভূতি যখন কাগজ-কুচির পাতায় স্থান পায় তখনই তা' সাহিত্যরূপ লাভ করে। সেই সাহিত্য প্রকাশের বিবিধ মাধ্যমের মধ্যে পত্রিকা অন্যতম মাধ্যম।

জ্ঞানের রাজ্যে মানুষ চিরমুক্ত, এই জ্ঞান দিয়েই কবি যেমন চেতনার 'আমি' কে পান্না রূপে খুঁজে পান, তেমনই জ্ঞানের বিচ্ছুরণে 'দিশারী'র আত্মপ্রকাশ। অন্ধকারে হাতড়ে না পাওয়া অনুভূতিকে আলোর দিশা দেয় যে উপলব্ধি, সেই উপলব্ধির নামই হল দিশারী। হীরালাল ভকত কলেজের বার্ষিক এই দিশারী পত্রিকা জ্ঞানের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কলেজের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সেই উপলব্ধির শরিক। তাঁদেরই অনুভূতির অংশীদার হয়েই এই পত্রিকার পথ চলা। তাই তাঁদের প্রতি এই পত্রিকার প্রতিটি পাতা কৃতজ্ঞ।

একটি পরিপূর্ণ সাহিত্যে যে সমস্ত বিষয় স্থান পায়, যেমন, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি এই সকলই এই পত্রিকায় স্থান পায়। উন্মেষিকতার প্রকাশ এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নয়, সারা বছরের ক্লাসমুখী অধ্যয়নের বাইরে মানব হৃদয়ে মৌলিকত্বকে খুঁজে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকা প্রবহমান। এই পত্রিকার স্মৃতি রোমন্থন করলে বিগত চিন্তা-ভাবনার সংস্কার যেমন উদ্ভাসিত হয়, তেমনই জ্ঞান পিপাসু লেখকদের একান্ত ব্যক্তিগত জগতের শরিকও হতে পারে পাঠক। তাই এ পত্রিকার গুরুত্ব অনেক বেশী।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত কুলপতি হিসাবে এই পত্রিকার ভুল ত্রুটির জন্য সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশের জন্য যাঁদের নিয়মিত ধারাবাহিক চিন্তা ও কর্ম জড়িত তাঁদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে পত্রিকার সম্পাদক আমাদের সবার প্রিয় ডঃ চৈতন্য বিশ্বাস মহাশয়, যার মননশীল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রচেষ্টা ব্যাতিত হয়তো এ পত্রিকা এ মাত্রায় মাত্রায়িত হতো না। এরপর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মাননীয় আমার বন্ধুসম অধ্যাপক ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী মহাশয়ের প্রতি, যিনি আমাকে কলেজের গঠনমূলক প্রত্যেকটি প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করে তোলেন, শুধু উৎসাহিত করেন তাই-ই নয়, প্রত্যেকটি কর্মের প্রায়োগিক দিকটিতেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আমি কৃতজ্ঞ কলেজের সমস্ত বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের প্রতি, যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া হয়তো বা পত্রিকা থমকে যেত। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই কলেজের সমস্ত শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের প্রতি, যাঁরা শুধু এ পত্রিকা নয়, এ কলেজের প্রত্যেকটি কর্মে আমাকে সহযোগিতা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি কলেজের ছাত্র সংসদের প্রতি, যাদের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি যেন শব্দ কুড়ুক। তাদের এই শব্দের খেলা ছাড়া এই পত্রিকা অন্ধকারেই তলিয়ে যেত। তাদেরই "আঠারো বছরের" ভাবনার উদ্যমে এ পত্রিকা ছিল, আছে এবং থাকবে...

দেবব্রত সাহা
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক,
হীরালাল ভকত কলেজ
নলহাটী, বীরভূম

১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭

২০১৭ সালে নির্মিত হীরালাল ভকত কলেজের মুক্ত মঞ্চে শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং সংশ্লিষ্টজনেরা

২০১৭, হীরালাল ভকত কলেজের ছাত্র-সংসদ

ছাত্র-সংসদ আয়োজিত 'নবীন বরণ ২০১৭' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সভাপতি শ্রী বিপ্লব ওঝা

সম্পাদকের কলম

প্রতি বছরের মতোই এবছরও যথা সময়ে কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা 'দিশারী' প্রকাশ হ'তে চলেছে। যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং সেই পত্রিকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা প্রকশের সুযোগ থাকা উচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হ'ল এই পত্রিকা। বলতেই পারি, পত্রিকা হ'ল একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের, তথা ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ। এর মাধ্যমেই তারা আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়। শিক্ষার লক্ষ্যই হ'ল বিকাশ সাধন। যথার্থ মানুষ হতে গেলে নিজের বিকাশ সাধন যেমন করতে হয়, তেমনি অপরকে যথার্থ মানুষ ক'রে তুলতে গেলে তাদের বিকাশ ঘটাবার সুযোগ ক'রে দিতে হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আমি ছাত্র-ছাত্রীদের সেই সুযোগটাই ক'রে দিতে চাই।

সুযোগ ক'রে দিলেই যে সকল ছাত্র-ছাত্রী সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পার, এমন নয়। পত্র-পত্রিকায় লিখবার জন্য মানসিকতাও থাকা চাই, প্রতিভাও থাকা চাই। উপদেশ দিয়ে, উৎসাহ যুগিয়ে, প্রেরণা জাগিয়ে আমরা মানসিকতা গ'ড়ে তুলতে পারি, কিন্তু, প্রতিভা ঈশ্বরের দান। কোনো ব্যক্তি চাইলেই যে ঈশ্বরের দান পেয়ে যাবে, এমন নয়। তাই, গল্প, কবিতা ইত্যাদি লিখবো বললেই লেখা যায় না। মেধাবী ছেলে-মেয়েরাও চাইলেই একটা কবিতা বা গল্প লিখে ফেলতে পারে না। এ বছর থেকে কলেজে সেমেষ্টার প্রথা চালু হয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য গুণের পরিচয় দিতে পারলেও কিছু নম্বর পাওয়া যাবে বলায় সাম্মানিক শ্রেণীর বহু ছেলেমেয়ে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ছাপাবার যোগ্য হয় নি। যে সব রচনার মধ্যে কিছু বিষয় আছে, বানান ভুল কম, সেগুলোই একটু ঘসে মেজে পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা করেছি।

এ বছর অবশ্য পত্রিকার পাতা ভরাবার উপযুক্ত লেখার অভাব হয় নি। বেশ কয়েকজন নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বছর কলেজে এসেছেন। তাদের কয়েকজন প্রবন্ধ লিখেছেন। পুরনো অধ্যাপকেরও গল্প-প্রবন্ধ বা কবিতা লিখেছেন। এই সব লেখার জন্যই এবারের পত্রিকাটি একটু স্বাস্থ্যবান হ'তে পেরেছে। তাঁদের লেখার বিষয়গুলো শিক্ষা সংক্রান্ত; তাই, ছাত্র-ছাত্রীরা পড়লে উপকৃত হবে। 'দিশারী' পত্রিকাটি মূলত, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা প্রকাশের মাধ্যম। তাদের লেখাগুলিই প্রকাশ পাওয়া উচিত। কিন্তু, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তেমন কোনো গল্প বা প্রবন্ধ পাওয়া যায় নি, যাতে পত্রিকার তিরিশটি পাতাও ভরানো যায়। তখন বাধ্য হয়েই শিক্ষকদের কাছ থেকে লেখা চেয়ে নিতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সব লেখা সংশোধন ক'রে তো ছাপার যোগ্য করা যায় না! তা' করতে গেলে এতটাই কলম চালাতে হবে যে, সে লেখা আর ছাত্র-ছাত্রীদের থাকবে না!

আমরা জানি, শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতি জড়িয়ে থাকে। যে যতটা শিক্ষিত, তার সংস্কৃতিও ততটাই উন্নত। আমি শিক্ষা বলতে স্কুল-কলেজ যাওয়া, সুযোগ-সুবিধা পাওয়া, অ্যাডমিটকার্ড আর মার্কসিটটা নেওয়া বুঝি না, আমার বিচারে, প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠা; একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠা। সুস্থ সংস্কৃতি হ'ল তাই, যা মানুষকে কল্যাণমুখী ক'রে তোলে, মানুষের মনকে বিকষিত ক'রে তোলে। মনে প্রশ্ন জাগে, এখনকার শিক্ষা সেটা করে কি না! যদি কেউ শিখতেই না চায়, তাহলে সুস্থসংস্কৃতির বিকাশ কীভাবে হবে? স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়া মানেই যে শিক্ষতে চাওয়া নয়, তা' কি কারো বুঝতে বাকি আছে! কলেজের কথাই ধরি, পাশ কোর্সে একশো জন ভর্তি হচ্ছে, সেখানে ক্লাসে উপস্থিত থাকছে

বারো থেকে পনেরো জন। বাকি ছেলে-মেয়েরা তাহ'লে কোথায় কী শেখে? বর্তমান বছর থেকে সেমেস্টার পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। ক্লাসে উপস্থিতির জন্যও নম্বর দেওয়া হবে। তাতেও কিন্তু উপস্থিতির হার বাড়েনি। এই অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা যে বাড়িতে পড়াশোনা ক'রে পরীক্ষা দেয়, তাও নয়। প্রথম বর্ষের পাশকোর্সে শতকরা ৫ থেকে ১০ জন পাশ করে, বাকীরা ফেল ক'রে পড়া ছাড়ে, অথবা একই পরীক্ষা বারতিনেক দিয়ে বিশ্রামগারে ঢুকে যায়। আর পরীক্ষা দেবার কথা ভাবে না।

এই ফেল করা ছেলে-মেয়েরা কি শিক্ষিতদের মধ্যে গণ্য হবে? এদের রুচি বা সংস্কৃতি কি উন্নত হবে? শিক্ষা আর সংস্কৃতি দু'টিই অনুশীলন সাপেক্ষ। যে যেমন অনুশীলন করে, সে তেমন অর্জন করে। অনুশীলন হ'ল সাধনা। সাধনা কখনো আরামের হয় না। আরামপ্রিয়, শ্রমভীরু ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা আর সংস্কৃতির ব্যাপারে যে পিছিয়ে পড়বে, তা' বলাই বাহুল্য। পিছিয়ে পড়াটা ছাত্র-ছাত্রীদের কাম্য নয়। তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলব, সরকার এবং অভিভাবকেরা দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছেন, তোমরা নেবার জন্য হাতটা বাড়াও। শরীর আর মনটাকে একটু পরিশ্রম করাও। প্রাপ্তি তোমাদেরই হবে; সমৃদ্ধ হবে তোমরাই।

এবারের পত্রিকা অন্যান্যবারে তুলনায় একটু স্ফীত। লেখার মান কতটা উন্নত, সে মন্তব্য আমি করব না। পাঠকের ভালো লাগলে আমাদের সার্থকতা। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ুক, উৎসাহিত হোক। তাদের জন্য আমার আশীর্বাদ রইল। কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে—সকলের শ্রীবৃদ্ধি কামনা ক'রে এখানেই শেষ করছি।

চৈতন্য বিশ্বাস
সম্পাদক, দিশারী পত্রিকা
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি

০১.০৯.২০১৭

শান্তিনিকেতনে বাংলা বিভাগ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
• সভাপতির প্রতিবেদন...		৬
• ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের প্রতিবেদন... "আসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতিগর্মময়ঃ...		৮
• সম্পাদকের প্রতিবেদন...		১১
ছড়া ঃ		
কথোপকথন	অয়ন্তিকা সরকার	১৫
রবীন্দ্রনাথ	শ্বেতা চন্দ্র	১৫
শরতের শোভা	পল্লবী মণ্ডল	১৬
পণপ্রথা	ইন্দিরা মণ্ডল	১৬
কুসংস্কার	আহাম্মদ রোজা	১৭
কালো	প্রিয়া সিংহ	১৭
স্নেহময়ী মা	সঞ্জয় কুমার রজক	১৮
শিক্ষা	তন্ময় মণ্ডল	১৯
কবিতার ভাবনা	বাসেরা খাতুন	১৯
মা	করবী মণ্ডল	১৯
She Comes Back Again	Abdur Rakib	২০
লজ্জা	শাহরুখ আহম্মেদ	২০
বর্ষা	খালেদা বেগম	২১
নতুন বছর	প্রতাপ মণ্ডল	২১
মা	সুদীপ্ত পাল	২২
বর্ষা	সমন্ত রায়	২২
গাছ কেটো না	কঙ্কাবতী লেট	২৩
চিন্তা	সন্দীপ মাল	২৩
ম্যাগাজিনের ছড়া	দীপক রবিদাস	২৪
পণপ্রথা	মিতা খাতুন	২৪
পরীক্ষা যে এসে গেল	সূর্য সাহা	২৫
বর্ষাকাল	শর্মিষ্ঠা প্রামাণিক	২৫
শরৎ এলে	বনশ্রী মণ্ডল	২৬
স্বপ্ন	সুইটি খাতুন	২৬
ঘুম	অর্পিতা মণ্ডল	২৬
কবিতা ঃ		
তোমার জন্য	কাজল শা	২৭
চেয়ে দেখো	সুরজ লেট	২৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তোমার জন্মদিনে	নীলমণি মুখোপাধ্যায়	২৮
হুকারনামা	অতনু ভট্টাচার্য	২৮
হতে চাইনি সুজাতা কিংবা বনলতা	পিংকি মুখোপাধ্যায় (দাস)	২৯
যদি মনে রাখ	স্নেহাশিস সরকার	২৯
নির্বোধ	অনন্ত মণ্ডল	৩০
কবিতার বার্ধক্য	চৈতন্য বিশ্বাস	৩০
গল্প :—		
লক্ষ্মীপেঁচার গল্প	ড. রঞ্জিত কুমার সরকার	৩৩
ছিঁচকে চোর	সরজিত দাস	৩৯
মামার বাড়ির পথে	কলিমুদ্দিন সেখ	৪১
শিলা	সঙ্গিতা মার্জিত	৪৩
বন্যাত্রাণ শিবির	প্রিয়ংকোনসীপুরী	৪৫
এক স্মরণীয় দিন	সৌরভ প্রসাদ	৪৬
প্রবন্ধ :—		
সাইবার ক্রাইম : কিছু জানা-অজানা তথ্য	ড. বংশীধর সাহ	৪৮
ঝরা পাতা, কুঁড়ি ও মনোভাব	অধ্যাপক বিমল পাল	৫২
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৫৬
বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা	স্বপন সাহা	৫৮
প্রত্নতত্ত্বে সুন্দরবন	সুকুমার মণ্ডল	৬০
নারী কি স্বাধীন?	কাজী সাহিনা খাতুন	৬২
ধর্ম সম্পর্কিত কিছু আলোচনা	সোহেল রাণা	৬৪
শিশুশ্রম	আয়াত আলম	৬৫
মহামতি অশোক	আক্তার মোমিন	৬৭
ইংরেজি প্রবন্ধ :—		
• Voyages in the Third Theatre and its changing Language : A Revisionist study	Suddhasatwa Banerjee	৭০
• Groundwater Arsenic Contamination and its Health Impact in West Bengal	Kritiman Biswas	৭৮
• Relavance of Panchsh'eel for Sino-India Relations	Biman Saha	৮১
• Concept of Success : What we have and what we should have	Sudipta Singha	৮৪
• A Brief study of Mlotherhood : Some glimpses of the Aturghar of colonial Bengal	Amrita Biswas	৮৭

কথোপকথন

অয়ন্তিকা সরকার
সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত

নদীর জলে আকাশ, নীল রং
আকাশ শুধু চোখেই ডুবে থাক।
জলের তলায় লুকিয়ে রেখে মন
শরীরটুকু বৃষ্টি ধুয়ে যাক।

বৃষ্টি মানে মনখারাপের মেলা
শরীর জুড়ে বৃষ্টি ধুয়েই যাক।
চোখের কোণে অশ্রু নদীর ভেলা—
প্রেমের ভাষা এখনো নির্বাক।

আকাশ পানে তাকিয়ে শুধু দেখ
অস্তাচলে ফেরে দিনের রবি
ডুব বিকেলে মন হারিয়ে তোর
কল্পনাতেই গল্প গাঁথে কবি।

এবার তবে হাতটা তুমি ধরো
চলতে চলতে পথ হয়েছে শেষ।
স্মৃতির চোখে ভালোবাসা এঁকে
বন্ধ ঘরে স্মৃতিই অবশেষ।

বারেক শুধু হাতটা ছুঁয়ে ধরো
নিঝুম দুপুর মনটা বড়ো ফাঁকা;
সাত সমুদ্র, তেরো নদীর জল,
তেপান্তরের গল্প শুধুই আঁকা!

একলা বিকেল সঙ্গী হবে তোর,
বিকেলের ফুল বন্ধু হয়ে ফোটে
নরম নদীর দুকূল জুড়ে ঢেউ
চোখের তারায় বিষাদ ফুটে ওঠে।
হাতের পাতায় ভালোবাসার বাস,
আকাশজোড়া আমাদের মাঝখানে,
সেই আকাশেই বৃষ্টি হয়ে যাক।

রবীন্দ্রনাথ

শ্বেতা চন্দ্র
প্রথমবর্ষ, বাংলা

বৃক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল,
বট এবং পাকুড়;
কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
জন্ম তাহার কলিকাতায়,
জোড়াসাঁকো নাম;
সেই সময়ে ছিল সেটা,
যেন একটা গ্রাম।
বাবা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ
মা সারদা দেবী;
ছোট্ট থেকে কবিতা লিখে,
হলেন বিশ্বকবি।
ছোট্ট বেলায় বসে থাকতেন
জানালাটার ধারে;
যা দেখতেন তাই লিখতেন
ছন্দের মিল করে।
কাব্য লিখে ধন্য হলেন
নোবেল পুরস্কারে।
ডি-লিট, নাইট এরূপ কত
পেয়েছেন সম্মান।
শান্তিনিকেতনের জন্য
কেঁদেছিল তাঁর প্রাণ।
শিক্ষার তরে সেথায় একটি,
গড়েন বিদ্যালয়,
সেটিই বিশ্বভারতী নামে
বিশ্ববিদ্যালয়।
দেশ-বিদেশে, স্থানান্তরে,
নামটি গেল র'টে
আজও আমরা তাঁর নামেতেই
ধন্য জাতি বটে।

শরৎ-এর শোভা

পল্লবী মণ্ডল
তৃতীয়বর্ষ, বাংলা

ঝিম্‌ঝিম্‌ঝিম্‌ বর্ষা শেষে শরৎ এলো জানি
তোমার রূপে রূপবতী এবার ঋতুর রাণী।
শিউলি ফুলের গন্ধে যে মন, হয় গো পাগল পারা,
তোমার সাজে তোমার গানে জগৎ মাতোয়ারা।
নদীর তীরে কাশের বনে দেখ্‌লে গো চোখ জুড়ায়,
নীল গগনে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ায়।
মিঠে সোনার রোদে আকাশ ঝলমলিয়ে ওঠে,
জুঁই, করবী, শালুক, পদ্ম প্রভৃতি ফুল ফোটে।
শুভ্র মেঘের ছায়া পড়ে কালো দিঘীর জলে,
সবুজ ধানের ক্ষেতের উপর বাতাস খেলা করে।
কোয়েল, শ্যামার গানে জগৎ হয়গো মুখরিত,
পুজোর সেরা দুর্গা পুজো হয় গো অনুষ্ঠিত।

পণ প্রথা

ইন্দিরা মণ্ডল
প্রথমবর্ষ, বাংলা (অনার্স)

পণ প্রথা বিষম প্রথা—চাবুক মারে কত,
পিতার ঘরে কন্যা বাড়ে আশা কত শত!
বয়স কালে বাবাময়ের বোঝা হয়ে যায়,—
দুঃখে ভরা জীবনটা যে কুঁরে কুঁরে খায়।
আজ কন্যা আদরিনী, কালকে হবে মা,
সেই জননী সমাজ মাঝে মূল্য তো পায় না!
ছোট্টো কালে পিতার ঘরে, বিয়ের কালে বর
বৃদ্ধকালে যুবক ছেলে সামলে কি দেয় ঘর।
পণের শিকার, প্রথার শিকার শিকার তো সব খানে,
এর মধ্যেই খুঁজতে হবে বেঁচে থাকার মানে।

কুসংস্কার

আহাম্মদ রেজা
প্রথমবর্ষ, বাংলা

ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি আসে, মোরগ ডাকলে ভোর,
কুকুর ডাকলে লেজ গুটিয়ে ছিটকে পালায় চোর।
পেঁচা ডাকলে অশুভ হয়, শকুন ডাকলে মরণ,
হঠাৎ কোনো বিপদ নাকি কাকের ডাকের কারণ।
পাখি ডাকলে কুটুম আসে, মিষ্টি হাতে নিয়ে,
বৃষ্টির মাঝে রোদ হলে হয় শেয়াল মামার বিয়ে।
সত্য মিথ্যা যাচাই করি টিকটিকিটির ডাকে,
বউ পাগলা সেই ছেলেটা, ঘাম থাকে যার নাকে।
হঠাৎ ক'রে চোখ কাঁপলে দুঃখ আসে বটে,
বসা নাকি যাবে না ঐ ঘরেরই চৌকাটে।
যাত্রা নাকি অশুভ হয় দেখলে কলস পথে,
কাঁড়িকাঁড়ি টাকা আসে চুলকালে ডান হাতে।
ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতে মুরব্বিদের মানা
কুসংস্কারে আমরা আজও চোখ থাকতেও কানা।

কালো

প্রিয়া সিংহ
প্রথমবর্ষ, সাধারণ

সবাই বলে কালো মেয়ে
করবে নাকো বিয়ে,
কালো মেয়ে মরুক তবে
গলায় দড়ি নিয়ে!
এ জগতে কালো মেয়ে
সবার কাছে ঘৃণ্য
কালো মেয়ের জন্ম হলো
তবে কিসের জন্য?
বাইরে যাহার কালো বরণ
ভেতরটাতো সাদা,
কালো সোনার সঙ্গে দেখো
প্রেম করেছে রাধা।
বিশ্বে যদি কালো কিছুর
না-ই থাকতো দাম?
জানি কবেই ঘুচে যেত
কালীমাতার নাম!
কালো সবার মাথার চুল, আর
চোখের তারাও বটে,
কালো কাজল আদর করে
টানে চোখের পটে!
কালো কোকিল মাতায় জগৎ
বসন্তে তার গানে।
কালো মেঘই জগৎ বাঁচায়
বৃষ্টি ফোঁটা দানে।
কালো কালো মৌমাছিরা
দান করে যায় মধু,
সবার প্রাণে শান্তি দিতেও
পারে কালো বধূ।

স্নেহময়ী মা

সঞ্জয় কুমার রজক
বি.এ. প্রথমবর্ষ

তোমার স্নেহের পরশ দিল আমার চোখে আলো,
তুমি আমার স্নেহময়ী, সবার থেকে ভালো।
যেদিন থেকে বুঝতে পারি তুমি আমার মা,
মা ছাড়া আর আপন বলতে কাউকে বুঝিনা।
সবাই বলে, ঠাকুর বড়ো, আমি বলি, মা—
সবকিছুকে ভুলে গেলেও তোমায় ভুলব না।
মা গো, তোমার জীবনে আমি দেবনা কোনো ব্যথা,
সকল দুঃখ ভুলে গিয়ে ভাব সুখের কথা।

তোমার স্নেহের পরশ দিল আমর চোখে আলো,
তুমি আমার স্নেহময়ী সবার থেকে ভালো।
তুমি আমার হাতটি ধরে হাঁটতে শিখিয়েছো
তুমি আমার বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছো।
মা গো আমার, তোমায় আমি অনেক ভালোবাসি,
আমায় দেখে তোমার মুখে হয়তো ফোটে হাঁসি।
জন্ম আমার ধন্য মাগো, তোমার কোলে এসে,
বাকি জীবন কাটিয়ে যাবো তোমায় ভালোবেসে।

শিক্ষা

তন্ময় মণ্ডল
দ্বিতীয় বর্ষ, ইতিহাস

শিক্ষা হল সবার তরে
সব বিধানে কয়,
প্রয়োজনে জ্ঞানার্জনে
দূরে যেতেও হয়।
শিক্ষা কালে শিক্ষা করো,
নাহি করো হেলা,
সময় চলে গেলে তুমি
পাবে না এক বেলা।
শিক্ষকগণ শিক্ষা দাতা,
রেখো তাদের সম্মান,
বড় হলে তুমিও এর
পাবেই প্রতিদান।
শিক্ষা মোদের আসল বাহন,
জীবন চলার পথে,
চলতে গিয়ে বাধা পেলে
চালায় সাথে সাথে।
শিক্ষা জেনো এমনই ধন,
চুরি নাহি যায়।
খাঁটি শিক্ষা মোদের সাথে
সারা জীবন রয়।

কবিতার ভাবনা

বাসেরা খাতুন
প্রথমবর্ষ, বাংলা

বাংলা ক্লাসে নোটিশ পেলাম, দিতে হবে লেখা,
ক'দিন পরেই প্রকাশ পাবে দিশারী পত্রিকা।
স্যার বললেন, শোনো সবাই ছাপছে ম্যাগাজিন,
লিখবে গল্প, কবিতা; আর বাকি দশটা দিন।
ঘরে ব'সে ভাবছি শুধু লিখব আমি কী!
ভাবনা আমার হয় না শেষ, ভেবেই চলেছি!
পদ্য লিখবো কোন্ বিষয়ে, পাইনা খুঁজে আমি,
কিন্তু জানি কবিতাটা লিখতে হবে দামী।
বহুদিনের স্বপ্ন আমার ম্যাগাজিনের পাতায়,
থাকবে আমার মনের ভাষা আমারই কবিতায়
লিখলাম এই কথাগুলো, ভয়টা রেখে পিছে,
স্বপ্ন আমার সত্যি হলে ভয়টা যাবে ঘুচে।
অনেক কথা মনে আসে, হয়না তা'কবিতা,
মনের মতো হয়না লেখা, সবাই ভাবে, যাতা।
স্মরণ করি বাগ্দেবীমায়, একটু কৃপা করো—
মনের মধ্যে একটা ভালো ছড়াও তুলে ধরো।

মা

করবী মণ্ডল
প্রথমবর্ষ, বাংলা

মায়ের চেয়ে এ জগতে হয়না বড়ো কেউ।
স্নেহের সাগর মায়ের বুকে ঢেউয়ের পরে ঢেউ!
মায়ের প্রাণের অংশ নিয়ে বাঁচে যে সন্তান,
তাইতো ছেলে-মেয়ের প্রতি মায়ের তে টান।

মায়ের স্নেহে দূর হয়ে যায় অনেক অমঙ্গল,
শিশুর কাছে স্বর্গ সমান মা'র আদরের কোল!
সেই মাকে যে দূরে ঠেলে, দুঃখ দিয়ে থাকে,
ভালো থাকা হয় না তাদের, তলিয়ে যায় পাঁকে।

মা আমাদের দেবীর মতো, ধরা ছোঁয়ার মাঝে,
মূর্তিমতী করুণা সে সব বিপদের মাঝে!
সেই মায়েরই চোখের জলের কারণ যাঁরা হয়—
মানুষ ব'লে ভাবতে তাদের অন্তরে সংশয়।

SHE COMES BACK AGAIN

Abdur Rakib
Part-Time Professor in English (Honorary)

She comes back again,
She speaks
In the silent Home of my Heart,
The enchanting melody of air
Whispers in the ears of youth
About the chastity of the maiden earth,
Who conceives from the ages of yore,
She kisses the lip of handsome Mind
With the love of vast firmament.
The Fire of Wisdom burns
The refuses of useless Fashions.
The Universe laden with the charms of the Green
Smiles in oneness of peace
For hundreds and hundreds of Light years.
The voice of Her virtue
Is on the increase;
She comes back again
And she speaks of Dreams of Win
Over the evils and the Uglinesses
Of erring Time
She comes back again.....
She comes back again and again.....

লজ্জা

শাহরুখ আহম্মেদ
দ্বিতীয়বর্ষ, ইংরেজি

মানুষ কাকে বলবে বল, মানুষের সংজ্ঞাটা কী?
কর্ম যাদের মানুষ মারা, তাদের আবার ধর্ম কী?
জঙ্গি হানা কার মদতে! দাঙ্গায় দেশ চাঙ্গা হয়?
লজ্জা কোথায় রাখিস, যখন নর-রক্তের গঙ্গাবয়?
রক্ত কেন ঝরে এত? এর পিছনে কার প্রতাপ!
দাঙ্গা-আগুন লাগিয়ে কারা সুখে পোহায় ধর্মতাপ?
হাওয়ায় কারা ছড়ায় বলো, প্ররোচনার বার্তাকে
আগুন কি আর এমনি জ্বলে? জ্বলিয়ে দিতে হয় তাকে!

সরল সাদা মানুষগুলো বোঝে না কার কারসাজি!
পয়সা পেলে পরের ঘরে আগুন দিতেও হয় রাজি।
পরের সর্বনাশ ঘটিয়ে যেজন ভালো থাকতে চায়,
আর যা-কিছু হোক না তারা, মানুষ পদবাচ্য নয়।
আমরা তাদের ভয় পাবো কি? মানুষকেই তো তাদের ভয়;
সবাই রুখে দাঁড়াই যদি, তাদের কি আর সাহস হয়?

বর্ষা

খালেদা বেগম
প্রথমবর্ষ, বাংলা অনার্স

গ্রীষ্ম শেষে ডুবল রবি,
বর্ষা এল দেশে।
নীল আকাশের নীচে নীচে,
মেঘ চলেছে ভেসে।
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আসে,
পুকুর ডোবা ভরে।
মাছগুলি তাই প্রাণ খুলে আজ,
সুখের খেলা করে।
ভিজে মাটির গন্ধে সাবার,
প্রাণ যে উদাস করে।
লাঙল কাঁধে সব চাষিরা,
মাঠে বেরিয়ে পড়ে।
চাষির মনে কত আশা,
ফলবে মাঠে ধান।
ব্যাঙ বাবাজি সন্ধ্যা হতেই,
গাইছে খুশির গান।

নতুন বছর

প্রতাপ মণ্ডল
প্রথমবর্ষ, বাংলা

ফোটে আজ শত ফুল পাখি গান গায়,
আমার গোপন আশা ভাষা খুঁজে পায়।
কী হল কী হল, সেই কে দেবে খবর
কত সুর নিয়ে এল নতুন বছর।
এসেছে নতুন অব্দ আছে কী তা মনে
নতুন কুসুম ফোটে বনে উপবনে
নতুন প্রদীপমালা দেবালয়ে জ্বলে
আমি আজ চুপ আছি মন কথা বলে।
কেন আজ এত হাসি রাঙালো হৃদয়
কেন আজ গাঢ় হল এই পরিচয়
কেন আজ ভুলে গেছি সব অভিমান
নতুন বছর এল শুনি তার গান।

মা

সুদীপ্ত পাল
প্রথমবর্ষ, কলা

পৃথিবীতে সব কেনা যায়
যায় না কেনা মা।
মায়ের মতো যত্ন আদর
কেউ তো করে না।
টাকা দিয়ে যায় না কেনা
মায়ের ভালোবাসা।
মা-ই পূরণ করতে পারে
সন্তানদের আশা।
কোথাও পাওয়া যাবে নাকো
মায়ের মত মন।
তাই তো চেয়ে থাকি মায়ের
মুখেই সর্বক্ষণ।
মা যেন এক ফুলের সাজি,
অনেক তাতে ফুল।
তাইতো আমি মা বলতে
করি না কোনো ভুল।

বর্ষা

সুমন্ত রায়
প্রথমবর্ষ, কলা

পূর্বের মেঘ ধেয়ে আসে
বর্ষা বাদল দিন।
শুকনো গাছে সবুজ পাতা
বাজায় যেন বীণ।
কৃষক ভায়া ভরসা করে
গুনছে দিনক্ষণ
বুনতে হবে সেনার ফসল
রয়না ঘরে মন,
আকাশে যখন মেঘ না করে
বাতাস আসে ধেয়ে।
পাখিরা সব বাসায় ফেরে
বৃষ্টিতে সব নেয়ে।
বাদল দিনের নবীন মেঘে
কবির মনে আশা।
ফুটবে কবে সব হারাদের
নব প্রশ্নের ভাষা।
যারা মোদের অন্ন যোগায়
দেয় যে দেহে বল,
বর্ষা দিনে ভিজে ভিজে
প্রাণ আছে অটল।

গাছ কেটোনা

কঙ্কাবতী লেট
প্রথমবর্ষ, বাংলা অনার্স

কাল যে ছিল গাছের সারি
আজ পড়েছে কাটা
রাস্তা দিয়ে তাইতো ভারি
শক্ত হল হাঁটা।
রোদ্দুরে গা যাচ্ছে পুড়ে
এখন রাস্তা ঘাটে,
বাইরে গেলেই ভর দুপুরে
মাথার চাঁদি ফাটে।
গাছগুলো দাম না নিয়েও
ফুল দেয়, ফল দেয়।
আকাশ জুড়ে মেঘ জমিয়ে
বৃষ্টিও নামায়,
ধসতে দেয়না মৃত্তিকাকে
শেকড়গুলোর ফাঁদে,
আটকে গেলে বৃক্ষ তাকে
শক্ত ক'রে বাঁধে।
হারিয়ে গেছে মাথার উপর
গাছের সবুজ পাতা।
জ্বলছে বাজার রাস্তা-ঘাট আর...
এই নাকি কলকাতা।
তাইতো বলি গাছ কেটোনা
গাছকে রাখো ধরে,
তা নইলে ভাই লক্ষ্মীসোনা
বাঁচবে কেমন ক'রে?

চিন্তা

সন্দীপ মাল
প্রথমবর্ষ, বাংলা

বড্ড জ্বালায় রাক্ষুসে পেট, দিই কি তোরে বল,
তোকে খুশী করার মতো নেই কোনো সম্বল।
অনেকক্ষণ সে পায়নি কিছু, পেটের কি আর দোষ,
খাদ্য-জলের অভাব হ'লেই বাড়ায় অসন্তোষ।
নাগালে নেই ক্ষুধার অন্ন, নেই পিপাসার জল,
পকেটে নেই কেনার মতো একটুকু সম্বল।
আইবুড়ো বোন ঘরেতে যার ভাবনা কি তার পর?
ক্ষুধায় কেন মরতে যাবে? মরণ রে তুই সর!
আমার মায়ের গল্প, সে তো চোখের জলের কথা,
বাপও কথা কয়না হেসে অন্তরে তার ব্যথা!

বড্ড জ্বালাস চিন্তা রে, তুই আমায় ছেড়ে দে না!
আমার পিছেই লেগে আসিস, আমি কি তোর কেনা?
মাগনা কিছুই দেয় না তো কেউ, গতর খেটে খাই,
মান বাঁচাতে, জান বাঁচাতে আমার তো কেউ নাই!
অন্ন খেয়েই থাকবো বেঁচে, মরণ রে তুই সর—
ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই ক'রেই জুটবে বোনের বর!
আমার স্বপ্ন পূরণ হবে, আসবে ঘরে হাসি,
চিন্তারে তুই ঘুমাতে যা, যারে সর্বনাশি।

ম্যাগাজিনের ছড়া

দীপক রবিদাস
প্রথমবর্ষ, বাংলা

লিখতে আমায় হবেই একটি ম্যাগাজিনের ছড়া!
কলম হাতে চিন্তা করি, হয় না কোনো পড়া।
কী যে লিখি কোন ভাষাতে,
পাই না ভেবে সারারাতে,
থাকবে না মান করো কাছে, আমার কপাল পোড়া!
সময়সীমা শেষের দিকে, হয়নি শুরু লেখা,
কাগজ-কলম ছাড়া আমি বন্ধ ঘরে একা!
ভাব আসে না আমার মাথায়,
দাগ পড়ে না খাতার পাতায়,
কাব্য দেবীর সঙ্গে আমার হয় না কেন দেখা?!
কাগজ কলম নিয়ে আমি বন্ধ ঘরে একা।

পণ প্রাথা

মিতা খাতুন
তৃতীয়বর্ষ, বাংলা

পণ কথাটা বাজঠে এখন জনগণের কানে
বুকটা করে দুরু দুরু মেয়ের বাবার প্রাণে।
পণ না হ'লে হয় না বিয়ে, এই আমাদের দেশ!
বে-আইনি ব্যাপার তবু হয় না তো নিঃশেষ!
পণের ভালো-মন্দ নিয়ে চলছে তো বিতর্ক,
পণের গন্ধে অন্ধ মানুষ ভাঙছে তো সম্পর্ক!
দেখছি কত পাত্রপক্ষ পণের আশায় থাকে,
তারাই মদত দিচ্ছে জানি ঘৃণ্য প্রথাটাকে!
বিদ্যাসাগর এদেশে কি জন্ম নেবেন আর
নারীর স্বার্থে যত্ন তিনি নেবেন কি আবার!
মায়ের মেয়ের মান রক্ষায় লড়াই প্রয়োজন;
মানুষগুলো মানুষ হ'লে ঘুচবে জানি পণ।

পরীক্ষা যে এসে গেল

সূর্য সাহা
প্রথমবর্ষ, বাংলা

পরীক্ষাতো কাছিয়ে এল, চিন্তা ক'রে মরি।
ভাবছি এখন ইতিহাসটা কোথায় ব'সে পড়ি!
হে ঈশ্বর! অঙ্ক যদি দশটাও ঠিক হয়,
পাশটা করতে পারলে আমার মুখটা রক্ষা হয়!
বাংলাতে ভয় করিনেকো, প্রশ্ন কমন পাবো,
ভূগোলটাতেই ভয়ে মরি হয়তো বা ডোবাবো!
আরো আছে ইংরেজিটা যত নষ্টের গোড়া,
শরীর ভাঙা শরীর শিক্ষা, পা থাকতেও খোঁড়া।
আর কিছুকে ভয় করি না, পরীক্ষাতেই ভয়,
পরীক্ষা হবে না দিতে,—এমন যদি হয়!

বর্ষাকাল

শর্মিষ্ঠা প্রামাণিক
প্রথমবর্ষ, বাংলা বিভাগ (অনার্স)

বর্ষা মানে টাপুর টুপুর
সারাটা দিন ধ'রে,
বর্ষা মানেই নদীর পথে
আসে যে বান তেড়ে!

আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে
ফুলের মতো বৃষ্টি,
আমি শুধু ভাবি মনে
একি অপার সৃষ্টি।

পাখিগুলো ভিজছে ডালে
এদিক ওদিক চেয়ে,
কলশি নিয়ে ভরদুপুরে
ভিজছে সে এক মেয়ে।

মনে পড়ে স্পষ্টভাবে—
সেই দুহাজার সালে
কী ক'রে যে জড়িয়েছিলাম
দুঃস্বপ্নের জালে!

সেই সে দিনটি সনের মধ্যে,
শিহরন যে লাজে,
ভুলতে কেউ পাবে না জানি
স্মৃতির মধ্যে জাগে।

এখনও যে সেই স্মৃতিটা
উঁকি দিয়ে থাকে—
কত মানুষ জলে ভাসে
কে তার খবর রাখে!

শরৎ এলে

বনশ্রী মণ্ডল
দ্বিতীয়বর্ষ, বাংলা

শরৎ এলে পদ্ম ফোটে,
কালোদীঘির জলে।।
শরৎ এলে মন নেচে যায়,
ঢাকের তালে তালে।।
শরৎ এলে স্নিগ্ধ দুপুর,
মনের মাঝে আসে।।
শরৎ এলে পূজোর সুবাস,
চারিদিকেই ভাসে।।

স্বপ্ন

সুইটি খাতুন
প্রথম বর্ষ, বাংলা

ছোট্ট শিশু স্বপ্ন দেখে বাহির পানে চেয়ে।
একটু বড়ো হলেই যাবে চাঁদের পানে ধেয়ে।
ফুলের বনে প্রজাপতির খেলার সঙ্গী হবে,
গাছের পাখি ঘরে এনে মনের কথা ক'বে!
ইচ্ছে হ'লেই পাড়ি দেবে সমুদ্র-পর্বতে,
ইচ্ছে হলেই পাখির মতো উড়বে সে পর্বতে।
মাঠ-ঘাট-বন পেরিয়ে যাবে রাজকন্যার দেশে,—
রাজার কাছে হাজির হবে বীর কুমারের বেশে!
বীরের মতোই দীন-দুঃখীর অভাব করবে দূর
সুখ-শান্তির পথে বাধা করবে শঙ্খচুর।

ঘুম

অর্পিতা মণ্ডল
দ্বিতীয়বর্ষ, বাংলা বিভাগ

আমি ছিলাম ঘুমের রাণী ঘুমের সে কি ধুম!
আমার ছিল মনের মানুষ, নাম ছিল তার ঘুম!
সে আজ কোথায় গেছে চ'লে,
চোখকে আমার যায়নি ব'লে,
মাঝরাতেও জেগে থাকি কী জানি কার খোঁজে!
কেউ আসে না আমার কাছে, আমায় কি কেউ বোঝে!

আমি এখন নিদ্রাবিহীন রাত জাগা এক পাখি,
নিজের ঘরে অন্ধকারে নিজের মতোই থাকি।
ঘুম না আসার সুযোগ নিয়ে
চিন্তা যত আসে ধেয়ে;
বুকের 'পরে পাষাণভারের বেদনাটিই পাই;
মনে প্রাণে আমি এখন ঘুমের সঙ্গ চাই।

তোমার জন্য

কাজল সা
তৃতীয়বর্ষ, বাংলা

আমার প্রাঙ্গনে ঠেকেছে তোমার চরণ
আমি প্রসন্ন হয়েছি।
তোমার স্নেহময় বচনে।
ঘুচে গেছে আমার তৃষ্ণা।
অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে তোমাকে পেয়েছি
উজ্জ্বল আলোর মতো,
আমার হৃদয় আজ আপ্লুত।
বিষন্ন আমার চোখে তোমার হাস্যমুখ
একবুক ভরসা জাগিয়েছে।
ইচ্ছে করে, তোমার জন্য আমি কিছু গড়ি,
অন্তত কবিতা একটা লিখে যাই,
কিম্বা গলা ছেড়ে একটা গান গাই—
শেষ পর্যন্ত হয় না কিছুই;
ভেসে যাই, নিষ্কর্মার মতো শুধু কল্পনায়।।

চেয়ে দেখো

সুরজ লেট
দ্বিতীয়বর্ষ, বাংলা বিভাগ

একটু চেয়ে দেখো মানুষগুলোর দিকে;
শ্রাবণের বেহিসেবী ধারা ওদের গ্রাস করেছে।
আজ ওরা পরের জায়গায় বাস করে,
সরকারের ভিটের উপরে।
পরণে একটুকরো কাপড়, উসকো-খুসকো চুল,
বাচ্চারাও যায় না ইস্কুল।
সারাক্ষণ ভাতের সন্ধানে,—
তৃষ্ণার্ত ভয়ার্ত; নিরুদ্বিগ্ন মুখ খোঁজে
মানুষের ভিড়ে।
পরদুঃখে দুঃখীরা বস্তা ভরা সুখ
বয়ে আনে—বস্তাটা দেখিয়ে ফিরে যায়।
কাদামাখা মানুষগুলো পায়
বস্তা বস্তা প্রতিশ্রুতি, কথামালা—
স্বর্গ থেকে পেড়ে দেবে ফল—
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!
আপাতত যদি দিত একটু রুটি-গুড়,
পুরনো কাপড়, একটু জল—
হাতটা বাড়িয়ে দিলে হ'তে পারত সেটুকুই
হতভাগ্য মানুষের বাঁচার সম্বল।।

তোমার জন্মদিনে

শ্রী নীলমণি মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

তোমার জন্মদিনে আমি বলব না
এই দিনটা বারবার আসুক ফিরে
ও কথা তো সবাই বলে
জানি আসবেও তা,
বরং, বলব সেই কথাটা
যেটা বেরিয়ে এসেছে
আমার হৃদয় থেকে.....

জ্বলে ওঠ সূর্যের মত,
গর্জে ওঠ সাগরের মত
এগিয়ে চল ঝড়ের মত
বড় হও পর্বতের মত

কামনা করি—
এত বড় হও যে,
একদিন তোমার জন্মদিন
পালিত হবে হাজার হাজার
গুণমুগ্ধ মানুষের মধ্যে।

হকারনামা

অতনু ভট্টাচার্য
অতিথি অধ্যাপক (সংস্কৃত বিভাগ)

আমাকে সবাই চেনেন,
রামপুরহাট লোকালের ডেলি হকার—
আটটা একের।
কোলাভর্তি ধূপকাটি নিয়েই
আমার সারাদিনের জীবনবৃত্ত।
বউটা মরেছে আজ নিয়ে বারোটা বছর,
প্রায় সেই সময় থেকেই ঘরছাড়া,
যাকে বলে হকার।

কত লাঞ্ছনা, বিদ্রুপ, তাচ্ছিল্য বুকে পুষে
ট্রেনে উঠি—আর নামি।
বহু অনুনয় বিনয়ে আমার এই ধূপকাটি 'নে
একটু ভাবুন—
কোথায় যাবো আমি?
বুকভাঙা খাটুনি খেটে ব্যাচেলার ডিগ্রি করেছি ম

ট্রেন চলে ট্রেনের পথে
আমি চলি আমার পথে—
পাঁচ টাকার ধূপকাটির ক্যানভাসে
চেয়ে দেখি—
কতো বিমুখ মুখের তাচ্ছিল্যের ছবি।
আবার কখনো দেখি—
জানালার ফ্রেমে বাঁধা
হেমন্ত-ফাগুনের চলমান ছবি।

আউল-বাউলের আখড়ার পাশ কাটিয়ে
ইন্টারসিটি লেগেছে স্টেশনে।
ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলো কেবলই জ্বলেছে
রূপবহ্নিতে বিধ্বস্ত-ক্লান্ত শ্যামা পোকাগুলো
আমারই মতন ক্লান্ত বিষণ্ণ,
ঘরে ফেরার প্রতীক্ষায়।
সন্ধ্যাদীপ নিভে গেছে
অরক্ষণীয়া মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে,
ট্রেন-লেটের আশঙ্কায়
উনুনটা তখনো জ্বলছে।।

হতে চাইনি সুজাতা কিংবা বনলতা

পিঙ্কি মুখোপাধ্যায় (দাস)
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

তোমার অবহেলায় তিলে তিলে ক্ষয় হয়েছে
আমার সবটুকু ভালোলাগা।
তোমার তাচ্ছিল্যে
অতি সাধারণ সাজানো আমি
কি করে অন্যের চোখে অসাধারণ হয়েছি আমি
নিজেও জানিনা।
আমি তো কোনদিন হতে চাইনি সুজাতা কিংবা
বনলতা....
যাতে তুমি লিখতে পারো
আমায় নিয়ে একটা অসামান্য কবিতা।
চাওয়া পাওয়াগুলো ছিল
বড্ড ছাপোষা
লাল রং জামদানি
সাদা লাল দুটি চুড়ি
এক চিলতে কাজল আর ছোট্ট একপাতা লালটিপ
এটুকুই চেয়েছিলাম।
কবিতার খাতা খুলে উদাস চোখে শব্দ খুঁজি,
কত স্বপ্ন ছিল একবার অন্তত বলবো
তোমায় ভালোবাসি কিংবা
কেন এতো ভালোবাসো বলতো!
চোখের হিমবাহ গলে উষ্ণতার স্রোত নামে
কতবার বলেছি আর আসবোনা
তবু কতবার ফিরি
ঘৃণা, অবহেলায় নয়
ভালোবাসায়, অন্যমনস্কতায়....।

যদি মনে রাখ

স্নেহাশিস সরকার
তৃতীয়বর্ষ, বাংলা বিভাগ

একটি চারাগাছ,
সযত্নে বসালাম;
প্রকৃতি এবং আমার সাহায্যে
নতুন পাতা গজাল।

তার আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করলাম বেড়া,
সে যেন কখনও আহত না হয়।

রোজ যেতাম তার কাছে,
সেও এগিয়ে দিত সবুজ ডালটিকে—
স্পর্শ চাইত আমার।
চুম্বন করতাম তার কচি পাতায়
কতনা বিদ্রূপ করত লোকে।

ক্রমশ বড় হয়ে উঠল গাছটি,—
যাকে নিয়ে আমায় প্রচুর আশা;
তুলে ফেললাম নজরদারির বেড়া।

কিছুদিন পর—
আমার স্বপ্নের গাছ ভরে গেল ফুলে-ফলে,
তার সৌন্দর্যে প্রকৃতিও যেন গর্ববোধ করছে
আবির্ভাব হচ্ছে অনেকের,—
প্রজাপতি, পাখি, কতনা কীটপতঙ্গ।
আসুক। জানি, এগাছের প্রিয় শুধু আমিই।

তুমি সুখে থেকো
একদিন বসন্তের কোকিল হয়ে
বসব তোমার ডালে;
গান শোনাব গুণ্ গুণ্ স্বরে,
শুনবেতো আমার সে গান?

তবে শোন, তুমি কখনই ভেবোনা
আমার বাঁসা নির্মাণের ভাবনা,
সর্বদা তোমায় ডাকেরই প্রতীক্ষায়
যদি মনে রাখ
যদি মনে রাখ।।

নিঃস্ব

তন্ময় ঘোষ

শিক্ষক

সবাই আমায় বোকা বলে,
বলে বুদ্ধি নেই—আমি
আমিও কিছু বলতে পারি,
এই শিক্ষা আমাকে শিখিয়েছে বহু লোক।

এই পৃথিবীর সমাজে সবাই সুখের খোঁজে রয়।
তাই যে আমায় কেউ দূরে ফেলে রাখে।
কিন্তু আমি কোনো নই, কেউ নই, আমি নিঃস্ব।

আমি যা বলি, তার কিছুই বুঝি
সবাইকে আমার মনে সব সময় রাখি, তাই সুখী।
আমার বন্ধু আমি আমার কাছে নিয়ে আসি।
বহু লোক দুঃখ আমি বাস্তবতার জগতের অন্ধকারে রাখি।

আমি কারো ক্ষতি নেই।
কোনো কাজ নিজের স্বার্থে করি না।
আমি আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একদিন সফল হবই
আমরাই।
সেদিন যে নিঃস্ব, আমিও রাজপুত্র।

যদি চোখে জল আসে, হবে দুঃখের শেষ কোথায়?
যদি জল-ঝড়, চাকরী নিয়ে দুনিয়া জয় করে হবে সব কোথায়?
যদি ভালবাসা হই, হবে পরিকল্পনার জন্ম কোথায়?
এই পৃথিবীতে কেউ কারো না, কেউ কারো না,
কেউ দুঃখ না, কেউ উঁচু না
সবাই এক সমান আমরা।

কবিতার বার্ধক্য

চৈতালী বিশ্বাস

কবিতার বার্ধক্য এখন।
কবিতাকে বাঁচাতে হবে।—সকলেই বলছেন আজ
কবিতার বার্ধক্য এখন।

কবেকার হয়ে গেল, কবিতার ছন্দকে ভুলিনি,
মানুষের পড়ার ঘরে, অন্তরে,
কিন্তু এখন আর—
কবিতা বসবে না আর আমাদের পাশে।

প্রাঙ্গণেতে গেলে দেখি সেই বাড়ি,
কখনো সে 'নষ্ট' করে আমার কবিতা,
তুমি সন্ধ্যায়
কখনো সে দুঃস্বপ্নে চায়,
কিন্তু কথা শুধু বলে, ভুলিয়ে দিয়ে।

আমার মাথার উপর অন্ধকার বড় চোখে পড়ে
এখন উঠান ছেড়ে যৌবনের হাসির-ঝর্নাতে।
সে আজ শীতের ঘরে, পায়েস রাঁধে না,
আঙিনায় খেলা হলে ওঠে না, পড়ে না।

অসুখী হয়েছে সে, বিজ্ঞাপনের মত হয়—
কি আছে হাসি চমকে।
কখনো ঠাকুর ঘরে ডেকে নেয় সন্ধ্যার মন—
কবিতার বার্ধক্য এখন।।

দিশারী

সি.বি.সি.এস সেমিনারে আগত বক্তা ও অতিথিবৃন্দ

সি.বি.সি.এস. সেমিনারে সভাপতিকে বরণ করছেন
কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, দেবব্রত সাহা

দিশারী

দিশারী

সি.বি.সি.এস. সেমিনারে
প্রধান বক্তা শ্যামাপদ দে, সেক্রেটারি,
ইউ.জি.কাউন্সিল-কে বরণ করা হচ্ছে

সভাপতি ও প্রধান অতিথির প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের
মাধ্যমে সি.বি.সি.এস. সেমিনারের উদ্বোধন

দিশারী

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ১৫শো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার শেষ পাক

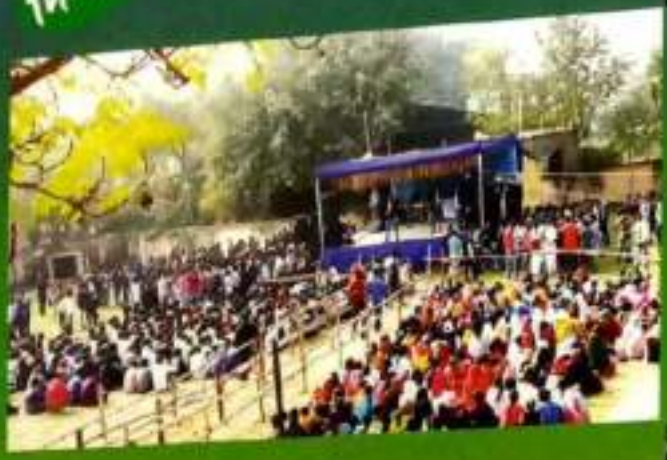

২০১৬-এর 'সোসাল ফাংশান'

১৫ই আগস্ট জাতীয় পতাকার নীচে হীরালাল ভকত কলেজের এন.সি.সি. ও এন.এস.এস. বিভাগ।

লক্ষ্মী পেঁচার গল্প

ড. রঞ্জিৎ কুমার সরকার
সহযোগী অধ্যাপক (অর্থনীতি)

।।১।।

ঘটনার সূত্রপাত এক শনিবার সকালে। শনি ও রবিবার বিকাশের ছুটি। সরকারী দপ্তরে চাকরী করে সে। ঘুম থেকে উঠে সকালের কাজকর্ম সেরে চায়ের অপেক্ষায় থেকে সেদিনের খবরের কাগজটায় চোখ বুলোচ্ছিল সে। চা খেয়ে বাজারে যাবে ঠিক করেছিল। কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পাঁচের পাতায় ছোট্ট একটা খবরে তার দৃষ্টি আটকে গেল। সরকারী কর্মচারীদের নূতন বেতন কমিশনের রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে একটা খবর রয়েছে। খবরটা পড়ে মনটা বেশ খুশী খুশী হয়ে উঠেছিল। এমন সময় চায়ের কাপ হাতে দীপা এসে ভাবলেশহীন গলায় বলল, "এবার পেঁচাগুলোর একটা ব্যবস্থা কর। আর তা না হলে সকালে উঠেই বাড়ীর দেওয়াল ও উঠান রোজ পরিষ্কার করো আর না হয় লোক রাখো। মিনতি (বাড়ীর কাজের মেয়ে) বলে দিয়েছে ও আর প্রতিদিন পেঁচার পায়খানা ও অন্যান্য নোংরা পরিষ্কার করতে পারবেনা।"

বেতন কমিশনের খবরটা আবার পড়ল বিকাশ। সত্যিই যদি বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় আর আগামী জানুয়ারী থেকে যদি তা কার্যকরী হয়, তাহলে ভাল হয়। অফিসে সবাই আলোচনা করছিল যে, এবার নাকি বেতন বর্ত্তমান বেতনের প্রায় আড়াইগুণ বাড়বে। আর তাছাড়া জিনিসপত্রের দাম যা বেড়েছে, তাতে বর্ত্তমান বেতনে সংসার চালানো বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। আর তাছাড়া বকেয়া দু'বছরের বেতনটাও যদি পাওয়া যায় তাহলে বাড়ীটাকেও সংস্কার করে একটু ঝকমকে করার ইচ্ছা আছে। আর নূতন কিছু শৌখিন জিনিসও কেনার ইচ্ছা আছে। দীপা আবার বলল, "কী হল, কথাটা কানে গেল না?"

বিকাশ কাউকেই চট্ করে মেজাজ দেখাতে পারে না, একটু নিরীহ গোবেচারা ধরণের। তবে দীপা বলে, "ভীতু এবং ঘরকুনো." সেই বিকাশ এবার কাগজ থেকে মুখ তুলে হেসে নরম গলায় বলল, "কী হয়েছে দীপা? সকাল বেলা এত বেজার মুখ কেন? দীপা ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "তোমারই বা সকলবেলা এত খুশী খুশী ভাব কেন?"

"খুশী খুশী ভাবের কারণ আছে। কাগজে দিয়েছে যে খুব তাড়াতাড়ি বেতন কমিশনের রিপোর্ট বেরুবে এবং সরকারও তা দ্রুত লাগু করার ভাবনাচিন্তা করছে।

দীপা এ কথায় আমল না দিয়েই বলল, "রাখো তোমার বেতন কমিশনের রিপোর্ট। দু'বছর ধরে ওই একই কথা শুনে আসছি যে, শীঘ্রই বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। সে যখন হবে তখন হবে। বাদ দাও ওসব কথা। এখন পেঁচাগুলোর কথা ভাব। ওগুলোর কিছু একটা গতি কর। গোটা উঠোনটা, আর দেওয়ালগুলোর পায়খানায় ভর্ত্তি থাকছে। আর কী দুর্গন্ধ! সাদা সাদা দাগ হয়ে যাচ্ছে। তার উপর কোন কোন দিন ইদুঁরের কাটা লেজ, কাটা মুন্ড, ব্যাঙের ঠ্যাং এসবেই ভর্ত্তি হয়ে থাকছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই এসব দেখতে কি ভালো লাগে? মিনতি ও প্রতিদিন পরিষ্কার করতে গিয়ে বিরক্ত হচ্ছে। বলেছে, "কাকুকে বলো পেঁচাগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে। আমি প্রতিদিন সকালে এই নোংরা পরিষ্কার করতে পারবো না।"

এবার সামান্য থতমত খেয়ে বিকাশ বলল, " পেঁচাগুলোর কী ব্যবস্থা করব বলো তো? ব্যবস্থা বলতে তো ওগুলোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে হয় আর তা না হলে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হয়।"

এবার দীপা বলে, না, না, মেরে ফেলার কথা আমি

বলছি না। আর তাড়িয়ে দিয়ে নিরাশ্রয় করার কথাও বলছি না। শুধু নোংরা আর আবর্জনার কথা বলছি। দেখো না ওগুলো কোনভাবে বন্ধ করা যায় কি না। কারণ লক্ষ্মীপেঁচা বাড়ীতে আছে, থাকুক না। সবাই তো বলে, লক্ষ্মীপেঁচা বাড়ীতে থাকা ভাল। সংসারে সুখশান্তি থাকে।

"সুখশান্তি যে কত আছে, তা তো সকালে উঠেই দেখছি," মনে মনে ভাবে বিকাশ, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। মিনমিনে গলায় বিকাশ বলে, দেখি কী ব্যবস্থা করা যায় এ ব্যাপারে। এখন বাজারের থলি আর তালিকাটা তো দাও, বাজারটা সেরে আসি। " বলে থলি হাতে বাজারের দিকে রওনা দেয় বিকাশ।

।। ২।।

বাজার যেতে যেতে পেঁচাগুলোর ব্যাপারটাই ঘুরপাক খায় মাথায়। আসলে বিকাশ সম্পন্ন চাষী বাড়ীর ছেলে। তার বাপ-ঠাকুরদা সকলেই চাষ থেকে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। বলতে গেলে, বিকাশই এই বংশের প্রথম চাকুরীজীবি। কিন্তু সেকালের চাষীবাসী মানুষদের বেশীর ভাগই ছিল মাটির বাড়ী। কিন্তু কোঠাপাড়া অর্থাৎ পাকাবাড়ীর দোতলার মত। এরপর একটি মাটির দোতলা বাড়ীতেই বিকাশ পড়াশুনা করেই মানুষ হয়েছে। তারপর সরকারী চাকরী পাবার পর মাটির বাড়ির সংলগ্ন ফাঁকা জমিতেই ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে দোতলা পাকাবাড়ী করেছে এবং এখানেই এখন সে বসবাস করে। ইতিমধ্যে মা ও বাবা গত হয়েছেন। মাটির বাড়ীটা এখন ফাঁকাই পড়ে আছে আর বাড়ীর যত অব্যবহৃত ও ভাঙা জিনিসপত্র রাখার জায়গা হয়েছে। এই মাটির বাড়ী এবং বর্ত্তমান পাকা বাড়ীর মধ্যে হাত দুয়েকের একটা ব্যবধান আছে। আর যাতে মাটির বাড়ীর ছাঁচানীর জল পাকাবাড়ীতে দেওয়ালে না লাগে, সেইজন্য দুটোর মাঝখানে একটা ঢালাই দেওয়া আছে। পেঁচাগুলো আশ্রয় নিয়েছে এই ঢালাই এর নীচের জায়গাটাতেই। কারণ এই জায়গাটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার, কেউ দেখতে পায় না, আবার রৌদ্র, ঝড়জল ইত্যাদিও প্রবেশ করে না। ফলে পেঁচাগুলি বংশানুক্রমিক ভাবে বহু বছর ধরেই আছে। তার উপর লক্ষ্মীপেঁচা বলে কথা, সৌভাগ্যের প্রতীক বলে ধরে তাকে বাঙালীরা, কাজেই প্রথমদিকে বিকাশ বা দীপা কেউই ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব দিতো না। বরং ভাবতো, থাক না দুটো প্রাণী। দীপা লক্ষ্য করে, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা দেওয়ার সময় পেঁচাদুটো মুখ বার করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে এবং তারপর একটু অন্ধকার হলেই উড়ে যায় খাবারের সন্ধানে। কিন্তু আজকে দীপার কথা শুনে এবং উঠোন ও দেওয়ালগুলো দেখে বিকাশের মনে হয় দীপা ঠিক কথাই বলেছে। লক্ষ্মীপেঁচা বাড়ীতে রাখতে গিয়ে তার মাশুল দিতে হচ্ছে খুব বেশী। এ যেন খাজনার থেকে বাজনা বেশী হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই তো সকালবেলায় উঠে ইঁদুরের কাটা লেজ বা মুন্ড বা ব্যাঙের কাটা ঠ্যাং আর সেই সঙ্গে পায়খানার দুর্গন্ধ দেখলে কারই বা মেজাজ ঠিক থাকে! মনে মনে দীপার উপর একটু করুণা হয় তার। না, এবার সত্যিই পেঁচাগুলোকে বিদায় করতে হবে। না হলে বাড়ীতে শান্তির পরিবর্তে অশান্তিই থাকবে। মনে মনে ঠিক করে বিকাশ। এসব ভাবতে ভাবতেই বাজারে পৌঁছে বাজার টাজার সেরে বাড়ী ফিরে আসে বিকাশ।

।। ৩।।

সোমবার অফিসে গিয়ে বিকাশ নিজের টেবিলে বসে কাজ শুরু করল। কিন্তু মাথার মধ্যে পেঁচার ব্যাপারটা ঘুরপাক খেতে থাকায় চোখে মুখে একটা বিরক্তির ভাব নিয়ে কাজ করতে লাগল। বিকাশের পাশের টেবিলেই বসেন সত্যরঞ্জনবাবু, সবাই তাঁকে সত্যদা বলেই ডাকে। খুবই হাসিখুশী, মিশুকে, সদালাপী, সৎ এবং পরোপকারী বলে অফিসে সুনাম আছে তাঁর। কেউ কোন সমস্যায় পড়লে তাঁর কাছে গিয়ে বললে একটা না একটা সমাধানের পথ বাতলে দেবেন তিনি। বিকাশও মনে মনে ভাবছিল যে লক্ষ্মীপেঁচার সমস্যাটা সত্যদাকে বললে হয় না? কিন্তু আবার লজ্জাও পাচ্ছিল। এমন সময় সত্যদাই বিকাশের বিরক্তপূর্ণ গম্ভীর মুখ দেখে নিজেই বললেন, "কি বিকাশ, এত গম্ভীর কেন? কোনো সমস্যায় পড়েছ নাকি?"

"হ্যাঁ সত্যদা, একটা পারিবারিক সমস্যায় পড়েছি, কিন্তু আপনাকে বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না।"

"পারিবারিক? মানে বউএর সঙ্গে কোনো ঝামেলা পাকিয়েছ না কি?" জিজ্ঞাসা করেন সত্যদা।

"আরে না, না, সেইরকম কোনো ব্যাপার নয়, সমস্যাটা আমার বাড়ীতে বাসা নিয়ে থাকা দুটো লক্ষ্মীপেঁচাকে নিয়ে। আর এটা নিয়েই দীপার সঙ্গে মনকষাকষি চলছে, এই আর কি!" বলে বিকাশ। এরপর ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে সত্যদার কাছে এবং ব'লে বিকাশের মনটা একটু হাল্কা হয়।

সমস্ত জেনে সত্যদা বললেন, "আরে এটা কোন সমস্যাই নয়। বর্ত্তমানে তোমরা লক্ষ্মীপেঁচা দুটোকে বাড়ীতেও রাখতে চাও না, আবার তাড়িয়ে নিরাশ্রয় করতে চাওনা, অথচ চাও যেন ওরা ভালই থাকে। তবে তুমি একটা কাজ কর না কেন, আমাদের বড়বাগানের কাছে বন দপ্তরের একটা Divisional Office আছে। শুনেছি ওরা সাপ, অন্য বন্য প্রাণী বা জন্তুকে বা বিরল প্রজাতির প্রাণীদের উদ্ধার করে এবং অসুস্থ দেখলে তাকে সুস্থ করে গভীর জঙ্গলে বা কোনো চিড়িয়াখানায় রাখার ব্যবস্থা করে। আর লক্ষ্মীপেঁচা তো একটা বিরল প্রজাতির প্রাণী। তোমাকে তো খুবই ভাগ্যবান বলতে হবে যে তোমার বাড়ীতে একটা নয়, দু'টো লক্ষ্মীপেঁচা বাস করে রয়েছে। তুমি একবার বনদপ্তরে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ওদেরকে জানিয়ে অনুরোধ করো যাতে ওরা পেঁচাদুটোকে ধরে নিয়ে গিয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে ছেড়ে দেয়। তাহলে ওরা নিরাশ্রয় ও হল না, আর তোমার সমস্যাটা মিটে যাবে।" পরামর্শটা ভালই লাগল বিকাশের। সে বলল, "ঠিক আছে সত্যদা, আমি কয়েকদিনের মধ্যেই ওখানে গিয়ে খোঁজখবর করব।"

|| ৪ ||

তখন ডিসেম্বর মাস, বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পৌষ মাস চলছে। কোনো একটা কাজে বড়বাগানের দিকে গিয়েছিল বিকাশ। কাজ শেষ করে ফেরার পথে রাস্তার ধারেই সবুজ ও লালরঙের বিরাট বাড়ীটি দেখে থমকে দাঁড়ায় বিকাশ। বাড়ীটির বিরাট গেটের মাথায় লেখা রয়েছে, Forest Office, Birbhum Division, West Bengal। বাড়ীটিকে দেখেই সত্যদার কথা মনে পড়ে যায় বিকাশের। ভাবলো ভিতরে গিয়ে লক্ষ্মীপেঁচাদুটির ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিলে কেমন হয়?" এই ভেবে গেটের ভিতর ঢুকে সাইকেলটা একপাশে রেখে গেটের দারোযানজীকে বলল, "আমার কিছু সমস্যা আছে একটু অফিসে কথা বলতে চাই।" দারোয়ানজী বলল, "চলা যাইয়ে অফিস মে।" ভিতরে ঢুকে দেখল প্রথম ঘরটিতে তিনটি টেবিলে একজন ভদ্রমহিলা এবং দুইজন ভদ্রলোক বসে কাজ করছেন। প্রথম টেবিলের ভদ্রলোকটির কাছে গিয়ে বলল, "স্যার, আমার কিছু সমস্যা আছে, যদি শোনেন।" "কিসের সমস্যা" জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক। "আজ্ঞে, পেঁচার ব্যাপারে", উত্তর দেয় বিকাশ। "ও, আচ্ছা, ওটা তো আমি দেখিনা, ওই যে পাশের টেবিলে দিদিমণি রয়েছেন আপনি ওনার কাছে গিয়ে বলুন, উনি পেঁচার ব্যাপারগুলো দেখেন।"

পাশের টেবিলের দিদিমণির কাছে যেতেই উনি বললেন, "বসুন চেয়ারে একটু। আমি হাতের কাজটা সেরে নিয়েই আপনার কী সমস্যা শুনব।" কাজ সেরে এবার বললেন, "বলুন আপনার কী সমস্যা। শুনে তিনি হেঁসে অত্যন্ত উৎসুক গলায় বললেন, "সত্যিই কি পেঁচাগুলো লক্ষ্মীপেঁচা? আপনি দেখেছেন ঠিক।" বিকাশ বললো, "আমি মাঝেমধ্যে দেখি, আর আমার স্ত্রী তো প্রতি সন্ধ্যাতেই দেখেন।"

"আপনি তো মহা ভাগ্যবান মশায়। আপনার বাড়ীতে দু'দুটো লক্ষ্মীপেঁচা রয়েছে। বাঙালীদের বাড়ীতে লক্ষ্মীপেঁচা থাকাটা খুবই দুর্লভ এবং সৌভাগ্যের। তাছাড়া ওরা তো আপনার বিশেষ কোন ক্ষতি করছে না। কাজেই আপনি ওদেরকে তাড়াতে চাচ্ছেন কেন?"

বিকাশ বলে, না, এমনিতে ওদের থাকা নিয়ে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু ওরা বাড়ীর দেওয়াল, উঠোন ইত্যাদি প্রতিদিন এমনসব আবর্জনা ফেলে নোংরা করছে যে তা নিয়ে বাড়ীতে অশান্তি হচ্ছে। সেই কারণেই ওদেরকে নিরাশ্রয় না করে আমি আপনাদের মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা করতে চাইছি।"

ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, দেখুন এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিতে গেলে আপনাকে সরাসরি DFO সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। উনি অনুমতি দিলে আপনি যা চাইছেন তা হতে পারে।"

"কোথায় বসেন উনি?" জিজ্ঞাসা করে বিকাশ। "সামনের বারান্দা দিয়ে গিয়ে একদম কোণের ঘরটাতে উনি বসেন। দরজার সামনে দারোয়ান আছে, ওকে বললে ওই আপনাকে DFO সাহেবের কাছে নিয়ে যাবে।"

বারান্দার কোণের ঘরের সামনে গিয়ে বিকাশ দেখল হাল্কা জলপাই রঙের উর্দি পরা একজন দরজার সামনের টুলে বসে আছেন। দরজার পাশে নেমপ্লেট রয়েছে —Mr. Bahadur Bhutia, IFS, Divisional Forest Officer, Birbhum Division । বিকাশ দারোয়ানজীকে বলে, " আমি কিছু সমস্যা নিয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই।" "কিসের সমস্যা?" দারোয়ানজী জিজ্ঞাসা করে। "পেঁচার সমস্যা নিয়ে।" "আচ্ছা, আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে এসে বলছি।" কিছুক্ষণ পর দারোয়ানজী এসে বিকাশকে বললো, "আপনি আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন।" ভিতরে ঢুকে বিকাশ দেখলো বিরাট অফিস ঘর, বিরাট একটা টেবিল, টেবিলের উল্টোদিকে রিভলভিং চেয়ারে চওড়া গোঁফওয়ালা যিনি বসে আছেন তিনিই যে DFO সাহেব তা বুঝতে পারলো। তাঁর সামনে আরও দুইজন ব্যক্তি বসে আছেন। DFO সাহেবের চেহারা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে উনি অবাঙালী আর যখন কথা শুরু করলেন তখন দেখা গেল উনি আধা হিন্দী এবং আধা বাংলাতে কথা বলছেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষাটা এখনও ভাল করে রপ্ত হয়নি। DFO সাহেব বললেন, "বসুন আপনি। হাঁ, আপনার বাড়ীতে পেঁচা নিয়ে কী সমস্যা হয়েছে?" বিকাশ তখন সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল। শুনে উনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি নিজে পেঁচা দেখিয়েছেন, ওরা কী সত্যিই আপনার বাড়ীতে আছে? বাড়ীতে তো পেঁচা বাস করে না।" বিকাশ বলল, "হাঁ স্যার, আমি এবং আমার স্ত্রী তো প্রতিদিনই সন্ধ্যাবেলায় একবার দেখি। তারপর ওরা উড়ে বেরিয়ে যায় এবং সারারাত্রি বাড়ীর আশেপাশে চিৎকারের শব্দ শুনতে পাই। আর সত্যিই ওরা লক্ষ্মীপেঁচা।" "ওরা কতদিন ধরে আপনার বাড়ীতে বাস করছে?" "অনেকদিন স্যার, অন্তত পনের-ষোলো বছর তো হবেই।" "তো এতদিন ওরা আছে, এখন আপনি ওদের সরাতে চাইছেন কেন?" "আসলে স্যার, ওরা যে সমস্যাগুলো বর্তমানে সৃষ্টি করেছে, আগে এগুলো ছিল না, কাজেই আমরাও কিছু মনে করিনি। কিন্তু এখন যেভাবেওরা প্রতিদিনই পায়খানা ইঁদুরের কাটা লেজ মুন্ড ইত্যাদি বাড়ীতে ফেলে সাংসারিক শান্তি নষ্ট করেছে তাই আর আমরা ওদেরকে রাখতে চাইছি না।" বলে বিকাশ।

আচ্ছা, ওরা কি সুস্থ আছে? কোন রোগ-টোগ হয় নি তো". জিজ্ঞাসা করলেন DFO সাহেব।

"সেটা কি করে বলব স্যার, আমরা তো ওদের সন্ধ্যাবেলাতেই একবার দেখতে পাই, আর সারাদিনই তো ওরা ওই গর্তের মধ্যে ঢুকে থাকে। তবে সুস্থ আছে বলেই মনে হয়।" বলল বিকাশ।

"ঠিক আছে, আমি অফিস থেকে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা গিয়ে ধরে নিয়ে আসবে।" বললেন DFO সাহেব। "না স্যার, এখনই তা সম্ভব হবে না। কারণ এখন পৌষমাস চলছে বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী পৌষমাস বাঙালীদের কাছে লক্ষ্মীমাস। এ মাসে ওদেরকে বাড়ী থেকে সরানো যাবে না স্যার।" বললো বিকাশ।

"তবে আপনি কিসের জন্য আমার কাছে আসিয়াছেন?" কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েই বললেন DFO সাহেব।

"স্যার, সমস্যাটা আমার অনেক দিনের। আমি এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, তখন আপনার অফিস দেখে মনে হল ব্যাপারটা একটু খোঁজখবর নিয়ে যাই। কারণ আপনারা এই কাজটা করবেন কিনা তা তো আমার জানা ছিল না। এখন আমি জেনে গেলাম। আমি এর পরের মাসে অর্থাৎ পৌষমাস শেষ হলে কোনো একদিন এসে আপনাকে খবর দিয়ে যাবো। তখন আপনি লোক পাঠিয়ে ব্যবস্থা করবেন।" বললো বিকাশ।

"আচ্ছা ঠিক আছে, তবে আপনি আপনার বাড়ীর ঠিকানা এবং মোবাইল নং লিখে দিয়ে যান, আমি দু'জন লোক পাঠাচ্ছি পেঁচাগুলো সুস্থ অবস্থায় আছে কিনা তা দেখার জন্য। একটা কাগজে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং লিখে দিয়ে বিকাশ বললো, "স্যার এখন তবে আসি, ধন্যবাদ স্যার।"

।। ৫ ।।

বিকাশ অফিস থেকে বেরিয়ে সাইকেলে বাড়ী ফিরে এসে দীপাকে সমস্ত ঘটনা বললো এবং বলল কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন লোক আসবেন পেঁচাদুটোকে দেখতে। আধঘণ্টা পর কলিং বেলের শব্দ শুনেই বিকাশ বললো, "ওই বোধহয় ওনারা এসে গেছেন।" দরজা খুলে দেখল একজন পুলিশের উর্দিধারী কোমরে 9mm পিস্তল গোঁজা ভদ্রলোক এবং অন্য একজন অফিসের কর্মী দুইজন এসেছেন। বিকাশ সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের বাড়ীর ভিতরে নিয়ে এল। "কই কোথায় আপনার পেঁচারা থাকে, দেখান তো "। বললেন পিস্তল গোঁজা অফিসারটি। (পরে জেনেছি উনি হচ্ছেন DFO সাহেবের বডিগার্ড)। বিকাশ ওঁদেরকে বাড়ীর ভিতরে উঠোনে এনে বলল, "স্যার এই যে মাটির বাড়ি (এটাতে অবশ্য আমি এখন বাস করি না।) ও বর্তমানে পাকা বাড়ীর মধ্যে উপরে যে লম্বা ফাঁকা জায়গাটা দেখছেন ওখানেই ওরা থাকে।"

"জায়গাটা দেখা যাবে," বলেন অফিসার।

"হ্যাঁ স্যার একটা মই লাগিয়ে উঠলেই আপনি দেখতে পাবেন।"

"মই আছে আপনার"?

"হ্যাঁ স্যার আছে আছে দেওয়ালে ঝোলানো অবস্থায়।"

অফিসার এবং সেই কর্মীটি (যার নাম দিলীপ) দুজনে মিলে মইটিকে মাটির দেওয়ালে লাগিয়ে অফিসার দিলীপকে বললেন, "যাও তো দিলীপ, দেখে এসো তো ওরা আছে কি না।" দিলীপ মই বেয়ে ওঠে দুই বাড়ীর ফাঁকটিতে চোখ লাগিয়ে দেখে বলল, "হ্যাঁ স্যার, রয়েছে। তবে টর্চ থাকলে ভাল করে দেখা যেত।" বিকাশ তখন বাড়ী থেকে একটা টর্চ নিয়ে অফিসারের হাতে দিতে, উনি মই বেয়ে ওঠে দিলীপকে দিয়ে এলেন। দিলীপ এবার টর্চের আলো জেলে ভালো করে দেখে বললো, হ্যাঁ স্যার, একটা নয় দুটো পাঁচাটি রয়েছে। লক্ষ্মীপেঁচাই মনে হচ্ছে স্যার।" "আচ্ছা ওরা সুস্থ আছে তো?" "হ্যাঁ স্যার সুস্থ বলেই তো মনে হচ্ছে।" "আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি নামো, আমি একবার দেখি।"

দিলীপ নামলে অফিসার নিজেই মই বেয়ে উঠে টর্চের আলো জেলে ভালো করে দেখে বললেন, হ্যাঁ ওরা সুস্থই আছে এবং ভালোই আছে।"

অফিসার বললেন। "দেখুন বিকাশবাবু, আপনি বললে আমরা ধরার যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে ওদের ধরে নিয়ে যেতে পারি। কোনো অসুবিধা হবে না।"

দীপা এতক্ষণ চুপচাপ এই কর্মকাণ্ড দেখছিল, একটা কথাও বলেনি। এবার সে বলল, "আচ্ছা স্যার, আপনারা ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে কি করবেন?" অফিসার বললেন, দেখুন আমরা প্রথমে দেখব ওরা সুস্থ আছে কিনা। সুস্থ থাকলে পরে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসব। কারণ এরা তো বিরল প্রজাতির প্রাণীর মধ্যেই পড়ে। কাজেই বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য পৃথিবীতে এদেরও প্রয়োজন আছে।" "ঠিক আছে স্যার, কষ্ট করে আসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই, আমি এই পৌষ মাসটা শেষ হয়ে গেলে পরের মাসে একদিন গিয়ে খবর দিয়ে আসব আপনাদের। তখন আপনারা যা ব্যবস্থা করার করবেন।" বললো বিকাশ।

।। ৬ ।।

বিকালবেলায় পাড়ার মন্টুদার সঙ্গে বিকাশের দেখা হল। মন্টুদা জিজ্ঞেস করল, "কিরে বিকাশ, দুপুরবেলা তোর বাড়ীতে নাকি পুলিশ এসেছিলেন, ব্যাপার কি?" "ব্যাপার কিছুই নয় মন্টুদা, ব্যাপার সেই পেঁচা, আর উনি পুলিশ নন, DFO সাহেবের বডিগার্ড। DFO সাহেব পাঠিয়েছিলেন পেঁচা দুটো কি অবস্থায় আছে তা দেখার জন্য এবং উদ্ধারের কি ব্যবস্থা করা যায় তা দেখার জন্য।" "ও তুমি কি ওদের আগে খবর দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, আমি বেলা এগারোটার সময় DFO অফিসে গিয়ে সবকিছু জানিয়ে এসেছিলাম।" বলল বিকাশ।

মঞ্জুলা বলল, "তা তুমিই বা হঠাৎ পেঁচা দুটিকে তাড়াবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন? লক্ষ্মীপেঁচা বাড়ীতে থাকা তো ভালো, এ তো সৌভাগ্যের লক্ষণ। সবার ভাগ্যে এই সুযোগ তো জোটে না। তুমি ভাগ্যবান, তাই তোমার বাড়িতে মা লক্ষ্মীর বাহন স্বয়ং বাস করছেন।" "আসলে ব্যাপারটা তা নয় মঞ্জুলা, আমি মোটেই ওদের তাড়াতে বা নিরাশ্রয় করতে চাইছি না। কিন্তু ওরা প্রতিদিন সকালে বাড়ীর দেওয়াল, উঠোন এইসব জায়গায় পায়খানা করে দিচ্ছে, ইঁদুরের কাটা মুণ্ড, লেজ বাক্সের উপর এইসব ফেলে দিচ্ছে, আর এতেই প্রতিদিন বাড়ীতে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমি ওদের জন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাতে চাচ্ছি, যাতে ওরাও ভাল থাকে, আর আমরাও শান্তিতে থাকি।"

"দেখো, যা ভাল বোঝ তাই কর।" মঞ্জুলা বললো।

॥ ৭ ॥

বাংলা পৌষমাস শেষ হবার পর মাঘমাসের কোন একটা দিনে বিকাশ দীপাকে বলল, "তাহলে এবার DFO Office -এ খবর দিয়ে আসি। ওরা এসে ওদেরকে ধরে নিয়ে যাক আর বাড়ীতেও শান্তি বজায় থাকুক।"

দীপা থমথমে মুখে বলল, যা ভাল বোঝ তাই কর। আমি আর কি বলব?" তবে গত কয়েকদিন ধরেই মা, মাসিমা, কাকিমা সবাইকে ঘটনাটা জানানোর পর ওঁরা সবাই এ ব্যাপারে নিষেধ করছেন। বলছেন, "লক্ষ্মী পেঁচাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিস না। এক-আধটু নোংরা ফেলছে তা ফেলুক না। ওটুকু মানিয়ে নে। সবার বাড়ীতে তো লক্ষ্মীপেঁচা বাসা বাঁধে না। তোদের বাড়ীতে আছে, এতো সুলক্ষণ।" বিকাশ বুঝতে পারে যে প্রথমদিকে যে দীপা ওদের বাড়ী থেকে তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল এখন ওর মধ্যে একটা সেন্টিমেন্টাল ভাব কাজ করছে। সেই ঝাঁঝ এখন আর নেই। তবুও বিকাশ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে DFO Office এ গিয়ে খবর দিয়ে এল। DFO সাহেব বললেন, "ঠিক আছে, একঘণ্টার মধ্যেই আমার অফিস থেকে লোক গিয়ে ওদের উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। আপনি বাড়ীতে গিয়ে অপেক্ষা করুন।" একঘণ্টা পরেই DFO Office থেকে সেই উর্দিধারী অফিসার এবং আরো দুইজন কর্মী, তাঁরা জাল, মই, খাঁচা ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে বিকাশের বাড়ীতে হাজির হল এবং পেঁচাদুটোকে ধরবার প্রস্তুতি শুরু করলো। এমন সময় দীপা ডাকলো "ওগো শুনছ, একটু শোনো তো।" বিকাশ এসে বললো, "কি হল?" দীপা বললো, "আমি বলছিলাম যে থাক না, ওদেরকে বাড়ী থেকে তাড়াবার দরকার নেই। সবাই যখন বারণ করছেন তখন থাক। এক-আধটু নোংরা ফেললে আমিই না হয় পরিষ্কার করে নেব। তুমি ওদেরকে বারণ করে দাও।" বিকাশ বলল, "তুমি সবদিক ভেবে বলছো তো, পরে কিন্তু এই নিয়ে বাড়ীতে অশান্তি করতে পারবে না তা বলে দিচ্ছি। আমার তো ওদেরকে তাড়াবার কোন ইচ্ছা ছিল না, শুধু তোমার বিরক্তির জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলাম।" বিকাশ তখন DFO সাহেবের উর্দিধারী অফিসারের কাছে গিয়ে বিনীতভাবে বলল, "স্যার, কিছু মনে করবেন না, ওদেরকে ধরে নিয়ে যেতে হবে না। ওরা যেমন আছে তেমনই থাক কারণ আমার স্ত্রী এখন তাঁর মত পাল্টে ফেলেছেন এবং ওদের ধরে নিয়ে যাবার ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছেন। আপনাদের বৃথা এত কষ্ট দিলাম স্যার, আমাদের মাফ করবেন। আসলে বাঙালীদের সংস্কার তো! এ ত্যাগ করা খুব কঠিন কাজ।" DFO সাহেবের অফিসার বললনে, "ঠিক আছে, আপনারা না চান, তবে আমরা ওদের ধরে নিয়ে যাচ্ছি না। তবে দেখবেন ওরা যেন সুস্থ ও ভাল থাকে, অসুস্থ হলে আমাদের অফিসে খবর দেবেন। আমরা এসে দেখে যাব।

"ঠিক আছে স্যার, তাই হবে। এখন আমার স্ত্রী আপনাদের জন্য একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করেছেন, এটুকু সেবা করুন স্যার।" জলখাবার খেয়ে DFO সাহেবের অফিসার ও অন্য দুই কর্মী ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। বিকাশও মনে মনে নিশ্চিন্ত বোধ করল।

ছিঁচকে চোর

সুরজিৎ দাস
বি.এ. প্রথমবর্ষ

অনেকদিন পর রাহুল আর চম্পা ওদের মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ি বেড়াতে এলো। ওদের এতদিন পর দেখে সবাই হই চই বাধিয়ে দিল। বুম্বা, টুম্পা, বুবুন দেখ কারা এসেছে।

রাহুলের এই বাড়িটা খুব ভালো লেগেছে। কত মানুষ থাকেন এই বাড়িতে। ছোট দিদুন বারান্দায় একটা বড় খাবার টেবিলে পর পর সব খাবার সাজিয়ে ডাকাডাকি শুরু করেছেন, বুম্বা, টুম্পা তোরা রাহুল আর চম্পাকে ডেকে নিয়ে খেতে বস।

হই হই করে বুম্বারা খাবার টেবিলে চলে এল। রাহুলা চেয়ারে বসার পর দেখে একটা চেয়ার খালি। কৌতুহলী হয়ে সে বুম্বাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে কে বসবে রে?'

আমাদের বড় মা বসবে।

আবার রাহুলের প্রশ্ন, বড় মা কে রে বুম্বা?

আমাদের দাদুর মা। জানিস রাহুল বড় মা খুব ভালো গল্প জানেন; আজ দুপুরে খাওয়ার পর বড় মার ঘরে আমরা সবাই গল্প শুনতে যাব।

রাহুল অবাক চোখে বড় মার আসবার পথের দিকে চেয়ে রইল। খুব ধীরে পায়ে সাদা ধপধপে কাপর পরনে একমাথা সাদা চুল, মোটা কাচের চশমা। তারপর তিনি চেয়ারে এসে বসলেন এবং বললেন, 'তুই বুঝি আমাদের মলিনার ছেলে, আর তোমার পাশে বসে তোমার বোন। রাহুল বলল হ্যাঁ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ির সব ছোটোদের সঙ্গে রাহুল আর চম্পাও গেল বড়মার ঘরে। গল্প শুনবে বলে। রাহুলকে বড়মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা আমাদের বাড়িতে আসনা কেন? তোমাদের স্কুলে গরমের ও পুজোর ছুটি পড়ে না?' হ্যাঁ পড়ে তো।' রাহুল বলল, 'কিন্তু ছুটি পড়লে বোন, মা, ঠাম্মি বাবা যেখানে চাকরি করেন, সেখানে চলে যায়। এখন কতদিনের ছুটি নিয়ে বাবা কলকাতায় এসেছেন। তা দিন পনেরো মত। ঠাম্মি জোর করে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিলেন।

বুম্বারা মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিল; রাহুলের কথা শেষ হলে টুম্পা বড়মার কাছে ছোটবেলাকার গল্প শুনতে চাইল। ছোটরা সবাই বড়মাকে ঘিরে বসল আর বড়মা তাদের কে গল্প বলতে লাগলেন।

জানো আমার বয়স তখন সাত বা আট হবে। আমাদের বাড়ির পাশে একটা ফাঁকা জমি পড়ে ছিল, আমরা পাড়ার ছেলেমেয়ে মিলে খেলা করতাম। একদিন দেখলাম সেখানে বাড়ি বানাবার জন্য তোড়জোড় চলছে। বালি ইট সব আসছে; সব বেশ ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু বিপত্তি শুরু হল একটা ছিঁচকে চোরকে নিয়ে। রোজই কারও না কারও বাড়ি থেকে ছোটোখাটো জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পাশের বাড়ির গোলককাকু একদিন সকালবেলা খবরের কাগজ পেলেন না। কদিন ধরেই আমার বাবা এক পাটি জুতো খুঁজে পাচ্ছেন না। আমার বন্ধু তাদের চিরুনী অদৃশ্য ।

এইরকম নানা ছোটখাটো জিনিস পাড়া থেকে উঠাও হয়ে যাচ্ছে। পাড়ার লোকেরা ছিঁচকে চোরের উপদ্রবে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের দাদারা পাড়ায় মিটিং ডাকল। এখন ছোট ছোট জিনিস যাচ্ছে। এরপর বড় জিনিস যাবে; কাল থেকে পালা করে নজর রাখব

—পাড়ায় অচেনা লোক কারা আসছে যাচ্ছে।

শুরু হয়ে গেল বড়ো নজরদারি। কড়া নজরদারি চলছে ওদিকে, আর এদিকে মণিদার লাল গামছা, বাবলু কাকুর পেন হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এতে দাদারা বেশ হতাশ হয়ে পড়ল। ঘটনা শুনে দাদারা মিটিং করল কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। তারপর ব্যাপারটা পুলিশকে জানালো।

এরই মধ্যে একদিন ভোরবেলা আমার কাকামণি যখন বাজার যাচ্ছেন, তখন দেখেন পাড়ার লেজ কাটা কুকুরটা মুখে করে কাদের একটা বাজারের ব্যাগ নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কাকামণি দেখতেই কুকরটাকে হ্যট হ্যট ক'রে। ব্যগটা ফেলে কুকুরটা ছুট। বাড়িতে এসে চা খেতে খেতে কাকামণি বেশ মজা ক'রেই কথাটা বলতে শুরু করলেন। দাদা মজা করে ঘটনাটা ওর বন্ধুদের বলল, দাদার মুখ থেকে শুনতেই ওর বন্ধুগুলো চিৎকার করে বলল ধরা পড়ে গেছে।

লেজ কাটা কুকুরটাকে অনুসরণ করে বাড়িটার পিছ গিয়ে দাদারা যা দেখল, তাতে ওরা চমকে গেল। দি দেখে লেজ কাটা কুকুরটার তিনটে ছানা একটা কি মুখে নিয়ে টানছে। পায়ের শব্দ পেতেই ছুট লাগা বাচ্চা কুকুরগুলোর পিছন পিছন গিয়ে দেখে কত ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমার বাবার একপাটি চটি, কাকুর খবরের কাগজ, বাবলুকাকুর পেন, মণিদার গামছা, চিরুনী আরো কত কী! চোরের হদিশ পাওয়া পর সকলের সে কী হাসি।

স্যার এবং ম্যাডামকে নিয়ে বাংলা অনার্সের তৃতীয় বর্ষের কয়েকজন

মামার বাড়ির পথে

কলিমুদ্দিন শেখ
প্রথমবর্ষ

একবার ঠিক হলো আমি এবং আমার তিন বন্ধু আলমগীর, আনন্দ, রাজু ও আমি মিলে কোলকাতায় আমার মামার বাড়ি ঘুরতে যাব। ইদের ছুটিটা আমরা সেখানেই কাটাব। কারণ, সেখানে দেখার ও ঘোরার মত অনেক জায়গা আছে আর রাত্রে কোলকাতা আরও সৌন্দর্যময় দেখায়। ইদ এর পরদিন কোলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

মোড়গ্রাম ব্রিজে পৌঁছে যথারীতি কোলকাতা যাবার গাড়ীতে উঠলাম। অনেক দিন পর আবার একসঙ্গে মুক্ত পাখির মতো ঘুরে বেড়াবো, সকালের মনে অনেক খুশি পাড়ি দিচ্ছে। আমি আমার মামার বাড়ির অনেক কথা তাদেরকে শোনাতে লাগলাম।

কৃষ্ণনগর এসে খাওয়ার জন্য গাড়ি থামলো। খাওয়া সেরে আবার গাড়ীতে উঠলাম। এখনকার মতো তখন মোবাইল পরিষেবা ছিল না, তা যাই হোক, আমাদের যাওয়ার খবরটা মামাকে চিঠির মাধ্যমেই জানাতে হয়েছিল।

আমরা যে গাড়ীটাতে উঠেছিলাম তাতে যাত্রী সংখ্যা খুব বেশি ছিলনা। তাই সহজেই বসার জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। গাড়ীটি খুব ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিল, তাই ঝিমুনি ভাবটা প্রত্যেকেরই এসেছিল। এমন সময় একটি শব্দ হল এবং গাড়িটি একটা ঝাঁকুনি মেরে থেমে গেল। আমার ঝিমুনি ভাব কেটে গেল। গাড়ীর একজনকে জিজ্ঞসা করে জানতে পারলাম, গাড়ির টায়ার পাঞ্চার হয়েছে। নীচে নেমে দেখি, খুব তাড়াতাড়ি কাজ করা হচ্ছে। এলাকাটা ভালো নয়। চোর-ডাকাতের ভয়। এখানকার পড়ন্ত বিকেলটার সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম, টায়ার সারাতে বেশি দেরি হলোনা। এদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হবার মুখে। গাড়িতে উঠে যে যার জায়গায় বসলাম এবং গাড়ি ছেড়ে দিল। কিছু দুর যাওয়ার পর গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ড্রাইভার বল্লেন আর যাওয়া যাবে না। কাছাকাছি কোন গ্যারেজও নেই।

বাসে যারা ছিল প্রত্যেকে নেমে কোলকাতা যাওয়ার পরবর্তী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। রাত্রি হয়ে গেল একটি গাড়িরও দেখা পেলামনা। গাড়ির কন্ডাকটার সকলকে বাসেই রাত কাটাতে বলেলন, সকলকে বাকি টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু কেউ রাজি হলো না গাড়িতে রাত কাটাতে। গাড়িতে রাত্রে থাকা নিরাপদ নয়, তাই যে যার মত রাত্রি কাটাবার নিরাপদ জায়গা খুঁজতে লাগল।

আমরা চারজন পড়লাম বিপদে। গাড়ির মধ্যে একটি পরিবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল; অগত্যা তাদের সঙ্গ নিলাম, অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা বাড়ি দেখে সেখান গিয়ে উঠলাম। অনেক ডাকাডাকির পর একজন বৃদ্ধলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। আমরা আমাদের বিপদের কথা জানাতে তিনি থাকতে দিতে রাজি হলেন। আমরা চারজন এবং সেই পরিচিত পরিবারটিও পরের ঘরে থাকতে জায়গা পেলাম।

বিছানাপত্র খুব যৎসামান্যই ছিল। বৃদ্ধ লোকটি একটি হ্যারিকেন দিয়ে গেল আমার কাছে কিছু বিস্কুট ছিল তা খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। দূর থেকে নিশাচর পাখির ডাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। পথের ক্লান্তিতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দরজা খোলার একটা ক্যাচ শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার কাছে একটি টর্চ লাইট

কলেজের এন.এস.এস. শিবির

দিশা

সঙ্গিতা মার্জিত
বাংলা সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ

আজ সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ আর ঝিমঝিম বৃষ্টি; মনটা বড় খারাপ খারাপ লাগছে। জানালা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি আর কখনো কখনো ধানগাছের সবুজ রঙ দেখছি। এমন সময় হঠাৎ করে স্মৃতির ছায়াপট থেকে একটি স্মৃতি মনকে দোলা দিল, অমনি-চোখ বেয়ে জল নেমে এল। এ স্মৃতি ভোলার নয়, এ স্মৃতি চিরঅক্ষয়।

আমার শৈশবের বন্ধু দিশা। আমাদের পাশের গ্রামেই তার বাড়ি। আমাদের গ্রামের প্রান্তে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেখানে দিশা পড়তে আসত। আমার এখনো বেশ ভালো মনে আছে যে, সে আর আমি রোজ বিদ্যালয়ে যেতাম, পাশাপাশি বসতাম, গল্প করতাম, টিফিন ভাগ করে খেতাম, হাসতাম, খেলতাম, আরো কত কী.....। মোট কথা আমরা দু'জনে খুব ভালো বন্ধু ছিলাম। এইভাবে হই-হুল্লোর করতে করতে আমরা ক্লাস ফোরে উঠলাম। বার্ষিক পরীক্ষা হল, ফলাফল বেরোল, দিশা অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করল, আমিও মন্দ করিনি। দিশার ভালো রেজাল্ট উপলক্ষে ওর বাবা আমাদের বাড়িতে মিষ্টি দিতে এসেছিলেন। কিন্তু তখন কি আমি জানতাম, এই শেষ মিষ্টিমুখ? আমাদের গ্রাম থেকে ৩০ মিনিট হেঁটে গেলে চাঁদপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়। ঠিক হলো—আমারা ওই বিদ্যালয়েই ভর্তি হব।

যথারীতি ভর্তির দিন দরজার কাছে এসে যেন কড়া নাড়তে লাগল। ভর্তির দিন অনেকে এসেছে, কিন্তু আমি দিশাকে দেখতে পেলাম না। আমার মন তো ভীষণ খারাপ। কোনোরকমে ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। মা'কে বারবার জিজ্ঞাসা করলাম, "ওমা, দিশা কি অসুস্থ, না কি ও এই স্কুলে ভর্তি হবে না? মা দিশা কি অন্য কোথাও ভর্তি হবে? মা বকে বললেন, "তোর যত আজগুবি চিন্তা চাঁদপাড়া ছাড়া তো আর কাছে-পিঠে অন্য বিদ্যালয় নেই। হয়তো অন্যদিন যাবে।" আমি বললাম, "বাবাকে বলো না মা, আমাকে দিশাদের বাড়ি নিয়ে যেতে।" মা বললেন, আচ্ছা তাই হবে। এখন খেয়ে নিবি চল। কিন্তু খাবার তো মুখে উঠতেই চায় না। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নেও আমি দিশার করুণ মুখের ছায়া দেখলাম, মনে হল ও যেন আমায় ডাকছে— "আয়....আমার কাছে আয়...।" আর থাকতে পারলাম না। বাবাকে বললাম, "আমি এখুনি দিশাদের বাড়ি যেতে চাই।" বাবা বললেন, "আগামী দিন সকালেই তোকে ওদের বাড়ি নিয়ে যাব।" কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত আমি যে কি দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছিলাম, তা প্রকাশ করা যাবে না, যা ভোলাও যাবে না। আর বলতেও পারব না, কারণ তা বলা শক্ত।

পরের দিন খুব সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল। বাবা এবং আমি চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে হল পথ যেন শেষ হচ্ছে না, কতদূর থেকে আসছি; অথচ এমন কিছু দূরত্ব নয়। অবশেষে দিশাদের বাড়ির কাছে পৌঁছালাম। দেখলাম, ওদের বাড়ির দরজার ডানদিকে একটা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে। আর কৌতুহল রোধ করতে পারলাম না। বাবাকে না নিয়েই আমি ছুটে চললাম দিশার বাড়ির দিকে। গিয়ে দেখি, বাড়ির মধ্যে দিশার কোলকাতার অহংকারী জ্যেঠুকে। ইনি এই সময়ে এখানে কী করছেন—এই প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। তাই আমি কুশল জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, অবশ্য জ্যেঠুও আমার

কুশল জিজ্ঞাসা না করে সরাসরি বললেন, "কী রে এত সকালে তুই এখানে কী করছিস? কী দরকার তোর? আমার তো তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা—উত্তর দিতে পারলাম না। পেছন থেকে বাবা উত্তর দিলেন, "আসলে দিশা গতকাল ভর্তি হতে যায়নি, তাই আমার মেয়ে ওকে দেখার জন্য উতলা হয়ে পড়েছে। আপনি যদি একবার দিশাকে......।" "ও, দিশা তো এখন তৈরী হচ্ছে।" জেঠু বললেন, "আপনি বোধহয় জানেন না-দিশা কলকাতায় ভর্তি হবে।" আমি বললাম, "কল...কাতায়?" জেঠু বললেন, "হ্যাঁ, এখানে তো একেবারেই পড়াশোনা হয় না, তাছাড়া এখানের কালচারও বিশ্রী; দিশা ভালো রেজাল্ট করেছে ও কোলকাতার নামী যে কোনও স্কুলে ভর্তি হতে পারবে।" আমি এই যুক্তি অগ্রাহ্য করে বললাম, "দিশা কি এখানে গ্রাম ছেড়ে, বাবা-মা ছেড়ে থাকতে পারবে? নতুন পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারবে? দিশার মা কি তাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন?" জেঠু বললেন "তোমাকে তা ভাবতে হবে না।" আমি থাকতে না পেরে বললাম, "আমি একবার দিশার সাথে....।" তিনি বললেন, "আমাদের ট্রেন নটায়; আমাদের যাত্রা করার সময় হয়ে এল।" জেঠু স্পষ্ট করে না বললেও আমরা বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি দিশার সাথে আমাকে দেখা করতে দেবেন না।

আমার বাবা অপমানিত বোধ করলেন। আমি আর বাবা বেরিয়ে এলাম ওদের বাড়ি থেকে এবং রাস্তার মোড়ে দাঁড়ালাম। কারণ দিশার মুখ যে আমাকে একবার দেখতেই হবে। মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় মনে একটা চিন্তা বারবার উঠে আসছিল যে দিশার ঠাকুমা, মা, বাবা কি তাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন? এমন সময় শুনতে পেলাম গাড়ির শব্দ। সামনে তাকালাম দেখলাম ঐ সাদা গাড়িটা আসছে। গাড়িটা পাশ দিয়ে পেরোতেই আমি দেখতে পেলাম দিশার রক্তিম মুখ, সজল চোখ। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। গাড়ির পেছনে পেছনে বাবার নিষেধ সত্ত্বেও ছুটে চললাম উদভ্রান্তের মত, অনেকক্ষণ পর বুঝলাম নিষ্ফল চেষ্টা। এমন স... জেঠুর কি মনে হল কে জানে, গাড়িটা দেখলাম ... গেল, দিশা নেমে এল। জেঠু আমাকে ডাকলেন, ... ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম দিশাকে, দু'জনেই কাঁ... লাগলাম। জেঠু ওকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নি... চলে গেলেন। তারপর কতক্ষণ কেঁদেছি মনে নেই...

আমি এখন কলেজে পড়ি। এখনও দিশার কথা ... পড়ে, বুঝতে পারি না কী করলে তাকে ভুলতে পা... পরে অনেক বন্ধুর সংস্পর্শে এসেছি; কিন্তু দি... জায়গাটা কেউ দখল করতে পারে নি, কারণ দিশাই ... আমার পথের দিশা ছিল। তখন অবশ্য এ উপলব্ধি হয়... হয় এখন। তাই একবার ওদের বাড়ি গিয়েছিলা... বাড়িতে ওর ঠাকুমা আর বাবাকে দেখলাম। তাদের প্র... করে কুশল জিজ্ঞাসা করতে তারা কেঁদে ফেললেন। আ... তখন দিশার কথা জিজ্ঞাস করলাম। ওর ঠাকুমা বললে... "দিশার কথা বললে বুক ফেটে যায়। ওর জেঠু গ... আমাদের কোল থেকে নিয়ে গেল, শিক্ষিত করার জ... কিন্তু কোলকাতা যে একটা যন্ত্র; ও সবাইকে যন্ত্র করা... চায়। গ্রামের মেয়ে যন্ত্র হবে কেমন করে, তাই মন... ওর বিকল হয়ে গেল।" আমি বললাম—"না, এ হ... পারে না.....।" ঠাকুমা বললেন, "হ্যাঁ, এইটাই সত্যি, দি... একটা মানসিক রোগী; তাই ওর মা ওর কাছে কোলকাত... আছে"—এই বলে গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তি... বললেন, "আর কি আমরা আমাদের দিশাকে ফিরে পা... না?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই পাবেন, ওর চিকিৎ... চলছে, ও নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবে"—এই বলে উ... পড়লাম।

বাড়ি ফিরে এসে কেবলই 'ছুটি' গল্পের ফটি... কথা মনে পড়ল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, দি... যেন সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু মনে যেন সেই কথাটা ... গেল না। কবিগুরু এতদিন আগে যে সত্যের দিক... নির্দেশ করে গেছেন, তাকে লঙ্ঘন করলে যে দুর্... অনিবার্য—একথা বুঝতে আমার আর বাকি রইল ন...

বন্যাত্রাণ শিবির

প্রিয়াংকা নন্দীপুরী
প্রথমবর্ষ, বাংলা

কদিন থেকেই বৃষ্টি। সারাদিন সারারাত ধরেই চলছে। এরপর তিন দিন প্রবল বৃষ্টি হওয়ার পর বন্যা দেখা দিল। নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়ে গেল। বন্যায় মানুষের ঘর-বাড়ি ডুবে গেল। বন্যা দুর্গতদের টিভিতে দেখাচ্ছে। বাচ্চা, নারী, বৃদ্ধ, অসুস্থ সকলের সে কি দুর্দশা, মাথার ওপর ছাদ নেই। বৃষ্টিতে ভিজে চলেছে। খাদ্য নেই পানীয় নেই।

ওদিকে যেদিকে বন্যা হয়নি সেই এলাকার লোকজন এলাকায় এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী, পুরোনো জামাকাপড়, চাল-ডাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে। সবাই সংগ্রহে এনে দিচ্ছে।

হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে মধু। কতই বা বয়স, ছয় কি সাত বছর। এই ছোটো বয়সেই মা-বাবা দুজনকে হারিয়ে বৃদ্ধা ঠাকুমার কাছে বড়ো হচ্ছে। বৃদ্ধা অতিকষ্টে শাক, গুগলি ইত্যাদি তুলে নিয়ে এসে তা হাটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। মধুও বৃদ্ধা ঠাকুমার সঙ্গে হাটে যায় শাক ও গুগলি বিক্রি করতে। তা বিক্রি করে যা টাকা পায় তা নিয়ে দোকানে চাল কিনে নিয়ে আসে তবেই বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে। আর যেদিন বিক্রি হয় না সেদিন তার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। ঘরে রোজগার করার মতো আর কেউ নেই। টাকার অভাবে পড়াশোনাও করা হয় না মধুর। তার নিজের সম্পত্তি বলতে আছে ছেঁড়া-ফাটা, সেলাই করা দুটি জামা ও একটি প্যান্ট। বন্যায় মানুষের দুর্দশা, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হাহাকার মধুর মনকে বড়ো আঘাত দেয়। কষ্টে আর্তনাদ করে ওঠে তার মন। তাই সে তার দুটি জামার একটি তুলে দেয় ত্রাণ সংগ্রহকারীদের হাতে। উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে যায়। মধুর কাছে জানতে চায় যে, তার দুটো জামার একটা দিয়ে দিলে তার চলবে কীভাবে। উত্তরে মধু বলে যে, তার যে দুটো জামা সম্বল। একটা চলে গেলে আরেকটা দিয়ে সে দিব্যি কাটিয়ে দেবে। কিন্তু যার একটা জামাও নেই তার চলবে কীভাবে। উত্তর শুনে নিস্তব্ধ হয়ে যায় সবাই, মনে মনে মাথা নত করে মধুর এই নিষ্পাপ পবিত্র হৃদয়ের কাছে। সবাই ঐ দরিদ্র মধুর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে যায়। দুহাত ভরে আশীর্বাদ করে তাকে।

কলেজের এন.এস.এস. বিভাগ

এক স্মরনীয় দিন

সৌরভ প্রসাদ

বি.কম (সম্মানিয়) তৃতীয় বর্ষ

তাড়াতাড়ি বাড়ির কাজ সেরে বাড়ি থেকে বেরোলাম। টোটো হয়ে সকাল ৮:৫৪ মিনিট-এর লোকালে চাপার জন্য স্টেশনে পৌঁছালাম। সেই প্রত্যেকদিনের রুটিনেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছিল। স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই দেখি, ট্রেনটি ঢুকছে। আমি ডেলি প্যাসেঞ্জার তো, তাই সাধারণত: আমাদের এই দেরিটা হয়ে থাকে।

তাড়াতাড়ি টোটো থেকে নেমে গিয়ে ট্রেনটিতে চাপলাম। যাক ভাগ্যভালো ট্রেনটি পাওয়া গেল। তা না হলে আরেকদিন দেরিতে পৌঁছাতে হবে, তখনই মনে পড়ে, সুশীলবাবু চেপেছেন কিনা। সুশীলবাবুকে ফোন করলাম। বললেন, "আজ্ঞে, হাঁ আমিও ট্রেনে চেপেছি, ৫ নং কামরায় আছি। এখানে খুব ভিড়, নেমে দেখা করছি একসঙ্গে যাব।"

মনে হল, যেন সুশীলবাবু অনেক ভিড়ে আছেন এবং সেই কামরাটিতে প্রচুর হইহট্টগোল হচ্ছে। সুশীলবাবু হলেন আমার প্রতিবেশী ও আমার অফিসের পাশেই একটি স্কুলের একজন শিক্ষক। রেল স্টেশন থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে সুশীলবাবুর স্কুল। সেখান থেকে ২ মিনিট দূরত্বে আমার অফিস। স্টেশনে নেমে সেই প্রত্যেকদিনের মতো আজও সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা করা ও সঙ্গে হেঁটে স্কুল পর্যন্ত যাওয়া। সেই হাঁটাচলার সময়ের মধ্যে আমাদের মধ্যে অনেক কথাই হয়। ভদ্রলোকটির ব্যবহার খুবই ভালো।

দুজনের মধ্যে কথা হল। আজ উভয়েই স্কুল ও অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি হবে। তাই, যার আগে ছুটি হবে সে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করবে। অফিসে পৌঁছে নিত্যদিনের মতো নিজের কক্ষে গিয়ে বসলাম। ইতিমধ্যে জয়ন্ত এসে হাজির হয়ে আমার সেইদিনের কর্মসূচীটি জানাল, "আচ্ছা, তাহলে কাজগুলি শুরু করা হোক নাকি?"

কাজের ফাঁকে জয়ন্তকে জিজ্ঞেসা করলাম "আজ কি কোনো ছুটির কথা ঘোষণা করা হয়েছে?" জয়ন্ত বলল "হাঁ স্যার আমিতো বলতেই ভুলে গেলাম, আজ বাস, ট্রাম বন্ধের ডাক হয়েছে; তাই, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি পাওয়া যাবে।"—শুনে একটু খুশি হলাম আজ বাড়িতে গিয়ে স্বস্তিকার সঙ্গে বেশী সময় কাটানো যাবে।

অফিসের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে বেরিয়ে পড়লাম জয়ন্তকেও ছুটি দিলাম। সুশীলবাবুকে ফোন করে বললাম "আমারও ছুটি হয়েছে, আপনার স্কুলের দিকে এগোচ্ছি।"

সুশীলবাবু জানালেন, "আমারও ছুটি হয়েছে আপনাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম, আপনি আসুন আমিও বেরোচ্ছি।"

সুশীলবাবুর সঙ্গে স্টেশনের দিকে এগোতে থাকলাম হঠাৎ সুশীলবাবুর মোবাইলে একটি ফোন এল। তিনি কথা বললেন ও ফোনটি পকেট রেখে দিলেন, জানালেন একজন আত্মীয়ের ফোন ছিল। তারা নাকি সুশীলবাবুর বাড়ি যাওয়ার জন্য গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। তারা সুশীলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব রাখলেন। তিনি আমাকে ছেড়ে তাদের সঙ্গে যেতে রাজী হইলেন না। আমি সুশীলবাবুকে ওনাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য জোর করলাম। ওনাকে অনেকবার বলার পরও তিনি মানলেন না। যেহেতু আমি ওনার প্রত্যেকদিনের সাথি। অবশেষে তিনি ওনাদের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন।

তখন আমার সেই কথা মনে পড়ল, "যে কেউ যে কোনো না কেন তোমায় ছেড়ে চলে যাবে, কেউ থাকবে না শুধুমাত্র মা-বাবা ছাড়া। এই অর্থে তৎকালীন কথাটি পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ সুশীলবাবু আমায় ছেড়ে যেতে চান নি আমিই জোর করেছিলাম।

সেখান থেকে স্টেশনের দিকে এগোতে লাগলাম। রেলস্টেশনে কিছুক্ষণ ট্রেনের প্রতীক্ষা করলাম। অন্যান্য অফিসের কর্মীদের না দেখতে পেয়ে আমি তাঁদের খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলাম, আজ ট্রেনটি আসবে না, ট্রেনটি আজকের জন্য বন্ধ আছে। রেলস্টেশন থেকে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওনা দিলাম। তখন আমার মনে পড়ে জয়ন্তের কথা। আজ বাস, ট্রাম বন্ধের ডাক। বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও কোনো যাত্রীবাহী যানবাহন পাওয়া গেল না। আমার মতো অনেক যাত্রী কিছু মালবাহী যানবাহনে চেপে নিজের গন্তব্যস্থলে রওনা দিলেন। শেষে কোনো বিকল্প না পেয়ে আমিও একটি ছোটো ট্রাক এর সামনে হাত দেখালাম থামার জন্য। গাড়িটি থামল, জিজ্ঞেস করলাম "দাদা একটু আগে ছেড়ে দেবেন? "উত্তর পেলাম "একা আছেন তো" বললাম "হ্যাঁ দাদা একাই" লোকটি খালি গায়ে ছিল এবং লুঙ্গি পড়েছিল। লোকটির সেই বেশভূষার কারণ ছিল আষাঢ় মাসের ভ্যাপসা গরম ও ট্রাকের ইঞ্জিনের গরম। উনি একের পর এক প্রশ্ন করলেন "আপনার নাম কী? কোথায় থাকেন? আপনি কি করেন? ইত্যাদি আমার পরিচয় দেবার পর মনে হল যেন উনি আমার উপর বিশ্বাসী হয়েছেন। তখন আমিও সেই ওনার প্রশ্নগুলিই করলাম। তিনি উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি চাকরী করেন তো? " আমি জানালাম "হ্যাঁ", তখন তিনি তার সিটের পাশ থেকে একটি থলে তুলে আমার কোলের উপর রাখলেন এবং বললেন, "খুলুন" থলেটা খুলে দেখি সেই থলেতে প্রায় দশ লক্ষ টাকা। আমি সেই টাকা দেখে চমকে বললাম "আপনি এই এত টাকা নিয়ে একাই যাচ্ছেন এতে তো আপনার প্রাণের ঝুঁকি।"

উত্তরে তিনি জানালেন, "তাই তো আপনাকে একাই চাপালাম। আপনাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হল তাই, আপনাকে এই কথাগুলি বললাম ও থলেটি দেখতে দিলাম। সেই উপদেশগুলি সঠিক। কখনও কখনও মনে হয়, লোকটি কে ছিল? কেন সে আমায় এমন উপদেশ দিলো? গাড়ি থেকে নামার সময় আমি ভাড়ার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি ভাড়া নিতে নারাজ হলেন। জানালেন, "এর কোনো প্রয়োজন নেই। কখনও কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন।" এই বলে তিনি কথাটি শেষ করলেন। উত্তরে আমি জানালাম "আবার দেখা হবে"।

তিনি তার নিজের গাড়িটিতে নিজের পথে রওনা দিলেন। এই কথাগুলির মাঝখানে কখন সময়টি কেটে গেল জানতে পারলাম না। ফোনে দেখি ২৯টি মিসড কল। ফোন কলগুলি বাড়ি থেকেই ছিল। বাড়িতে ফোন করলাম, কিন্তু বাড়িতে ফোন লাগল না। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে চললাম। পৌঁছে শুধালামা "কী হয়েছে? এতবার ফোন কেন করেছিলে? " উত্তরে মা জিজ্ঞাসা করলেন "খুব বড়ো হয়েছিস না! একবার ফোন তুলতে পারিস না?" গিন্নি বলল, 'আজ বাস বন্ধের জন্য আন্দোলনে কোথাও কোথাও খুব হাঙ্গামা হয়েছে, নির্দোষ মানুষকেও ভুগতে হয়েছে। তোমার অফিসে যাওয়ার সঙ্গী সুশীল বাবু নাকি আত্মীয়দের গাড়ি ক'রে বাড়ি ফিরছিলেন; আন্দোলনকারীরা নাকি সেই গাড়িতে পাথর ছোড়ে। তাতে গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়, ভাঙা কাচের টুকরোয় নাকি সুশীলবাবু ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। পুলিশের সাহায্যে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সুশীলবাবুর ভাই এসেছিলেন খবর জানাতে। কিন্তু, তুমি তো ফোনই তুললে না। তাই, তোমার কথা ভেবে খুব টেন্‌শান করছিলাম।"

গিন্নি একটু বিশ্রাম নিতে কথা থামাতেই মা গম্ভীর ভাবে বললেন, "এরকমটা যেন আর কখনো না হয়। সময়ে যদি একটা খবর দিতেও এত বিরক্তি, তাহলে আর কাড়ি কাড়ি টাকা দিয়ে ফোন কিনিস কেন?

আমার উপর ওদের রাগের কারণ আছে, আবার সুশীলবাবুর জন্য দুশ্চিন্তা মনে জায়গা জুড়ে বসেছে। তাই বৌ ও মায়ের কথায় রাগ করতে পারলাম না। ঠিক করলাম, হাতে মুখে জল দিয়ে কিছু টিফিন করে নিয়েই সুশীলবাবু বাড়ি গেলাম খোঁজ নিতে। প্রয়োজন হলে হাসপাতালে যাবো। কপালে ভোগান্তি থাকলে খন্ডায় কে?

সাইবার ক্রাইম কিছু জানা অজানা তথ্য

ড. বংশীধর সাহু
গণিতের অধ্যাপক

প্রতিদিন টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের শিরোনামে দেখতে পাই Cyber Crime জনিত নানা ঘটনা। Cyber অপরাধে কলকাতা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। Cyber Crime এর ফলে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে, Cyber Crime এর ফলে পশ্চিমঙ্গের বসিরহাটে তীব্র বিশৃঙ্খলা-গন্ডগোল চলছে। নানা ধরনের ঘটনার নেপথ্যে একটি শব্দ শুনতে পাই Cyber Crime স্বাভাবিক ভাবেই একটি প্রশ্ন বার বার উঁকি দেয়, Cyber Crime কি? কিভাবে আমরা Cyber Crime এ জড়িয়ে পড়ি? Cyber Crime এ অভিযুক্ত মানুষজনের জন্য কোনো আইনী-শাস্তি আছে কি?

Cyber Crime নিয়ে বলার আগে, আমার জীবনের একটি ঘটনা পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। প্রায় তিন বছর আগে আমি একটি e-mail পাই। সেখানে আমি ১০ লক্ষ টাকার লটারী জিতেছি এবং এই টাকা পেতে গেলে একটি লিংক ছিল সেখানে আমার সমস্ত তথ্য দিতে হত। আমি মহানন্দে আপ্লুত হয়ে ওই লিংক এ Click করে সমস্ত তথ্য দিয়েছিলাম। এর কয়েক সপ্তাহ পরে আমাকে কতকগুলো বিল পাঠানো হয় ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী কেনা কাটার। আমি হতভম্ব হয়ে ব্যাংকে গিয়ে দেখলাম আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তিন লক্ষ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। আমি কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম আমার অ্যাকাউন্ট Hacked করেছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে Email এ পাঠানো link এ click করেছিলাম বলেই। —একেই বলে Cyber Crime । আমার মতে "Cyber Terrorism"।

Cyber Crime হল —"সেই ধরনের কাজকর্ম যা আজকের আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমে মোবাইল, কম্পিউটার ইন্টারনেটের সাহায্যে কোনো ব্যক্তি বা দল বা সংস্থা বা সমাজ বা সরকারের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে সেই ব্যক্তি বা দল বা সংস্থা বা সমাজ বা সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দৈহিক বা মানসিক বা সামাজিক ক্ষতি সাধন করে।" এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় —

"Cyber Crime হল মোবাইল, কম্পিউটার ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপরাধমূলক কাজকর্ম।"

Technology -র শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথে Cyber Crime জনিত ঘটনা উত্তর উত্তর বাড়ছে। ব্যক্তিগত তথ্যচুরি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করা, ব্যক্তিকে ভয় দেখানো, দেশের প্রতিরক্ষা জনিত ভুল বার্তা প্রেরণ, শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার ক্ষেত্রে Cyber Crime আজকে দিনে ত্রাস হিসাবে দেখা দিয়েছে। তাই জেনে রাখা ভাল Cyber Crime কত ধরনের এবং কিভাবে ঘটে–

1) Hacking :

এ হল এমন এক ধরনের পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কম্পিউটার বা মোবাইল-এ থাকা তথ্যগুলিকে চুরি করা যায় বা e করে দেওয়া যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে Hacker রা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের system কে damage করে দিয়ে ব্যাঙ্কের গোপন তথ্যচুরি, অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার মত কাজ করে থাকে। এছাড়াও Hacking এর মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরিন তথ্য, প্রতিরক্ষা জনিত গোপন তথ্য, password, security code ইত্যাদি চুরি করে নিতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার সচল System, Software, Hardware কে damage করে দিতে পারে।

কিভাবে সম্ভব এই Hacking? Computer Programmer-রা Advance Computer Pro-

gram -এর মাধ্যমে একটি বার্তা বা Code পাঠায়। এই massage বা code এ ব্যবহারকারীগণ click বা open করলেই computer বা mobile এ থাকা। তথ্যগুলি Hacker -দের কাছে চলে যায়। কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের Hocker হয়।

a) White Hat Hacker - Computer এর Security Code কে ভেঙে দেয়।

b) Black Hat Hacker - Cmputer Security code কে violate করে

c) Grey Hat Hacker - Computer Security Code কে ছাড়িয়ে দেয়

d) Blue Hat Hacker এ ধরনের Hacker মাঝে মাঝে massage দেয় যে কোনো file বা system বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

2) Child Pornography :

শিশুদের নিয়ে যৌন বিকৃত রুচিশীল ছবি, চলচিত্র Animation, Cartoon ইত্যাদি তৈরী করা এক ধরনের Cyber Crime শিশুদের কে কোনো বিকৃত ও কুরুচিশীল কাজকর্মে লিপ্ত করা, যৌনগত ইঙ্গিত প্রদর্শনCyber Crime এর মধ্যে পড়ে। এই ধরনের চিত্র, Video, Cartoon ইত্যাদি তৈরী করা, ছড়িয়ে দেওয়া, হয়রানি করানো Cyber crime এর মধ্যে পড়ে?

3) Sextual Harasment : এই ধরনের Cyber Crime থেকে শিশু, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাদ যায় না।। অত্যাধুনিক Photoshop Softwar এর সাহয্যে বিভিন্ন ধরনের sextual ছবি, video বানিয়ে computer , মোবাইলের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে রাগ-ক্ষোভ-লালসা মেটানোর জন্য ব্যক্তি বিশেষকে সামাজিক ও মানসিক হয়রানি দেওয়ার জন্য এই ধরনের অপরাধ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ computer software- এর সাহায্যে একটি উলঙ্গ নারীর ছবিথেকে মুন্ডু কেটে নিয়ে এলাকার এক সুন্দরী মহিলার মুখ বসিয়ে দিয়ে whatsapp Facebook, Messenger -এর মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। কোনো একটি ছবির উপর যৌনগত মন্তব্য লিখে ছড়িয়ে দিয়ে blackmail করার চেষ্টা করে এবং ফলস্বরূপ ওই মহিলা বা ব্যক্তি আত্মহত্যার পথও বেছে নেন?

4) Identity Theft :

বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের Identity Code রয়েছে। যেমন ATM পিন নাম্বার, Internet Banking Password, File transfer পিন, e-mail password, computer বা মোবাইল password ইত্যাদি। কিন্তু চিন্তার বিষয় এই যে এই ধরনের Identity পিন চুরি হয়ে যাচ্ছে cyber crime -এর মাধ্যমে। বিভিন্ন ভাবে এই ধরনের পিন চুরি হয়ে যাচ্ছে-ফোনের বা email এর সাহায্যে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে আপনার কাছ থেকে গোপন পিন নাম্বার জেনে নিচ্ছে। এছাড়াও আমাদের কিছু অসচেতন ও গুরুত্বহীন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের গোপন তথ্য চুরি করে নেয়। যেমন ATM থেকে টাকা তোলার পর রসিদ টা ফেলে দেওয়া, ব্যাঙ্কের পাসবই অন্যকে দেওয়া, Tax form অন্যকে দেওয়া ইত্যাদি।

5) e-mail bombing :

নতুন, প্রযুক্তিগত ও আধুনিক crime গুলির মধ্যে e-mail bombing অন্যতম। e-mail এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বা সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের হুমকি আসার ফলে, ভুয়ো খবর প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এধরনের mail আসার ফলে ঐ সংস্থা বা ব্যক্তি নিজেদের protection এর জন্য অথবা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে অকারণে একটি সুস্থ system ভেঙে যায় ও ক্ষতি হয়। এছাড়াও এই ধরনের mail এর মাধ্যমে আকর্ষনীয় অফার লটারী prize জেতার offer দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

এছাড়াও নানা ধরনের Cyber Crime ঘটতে থাকে, যেমন—Cyber stalking, Cyber war,

money laundering, illegal EFT, Copyright infringement ইত্যাদি।

Cyber Crime দমনমূলক Act :

Criminal Procedure Act 1973 অনুযায়ী একজন পুলিশ অফিসার (DSP -এর নীচের rank এর অফিসার নয়), কেন্দ্র অথবা রাজ্য মনোনিত কোনো অফিসার যে কোনো public জায়গায় গিয়ে search করতে পারে, arrest করতে পারে সেকোনো সন্দেহজনক ব্যক্তিকে কোনরূপ arrest warrent ছাড়াই পরবর্তী কালে cyber crime দমন করা জন্য Information Technology (IT) Act 2000 এবং Indian Penal Code (IPC) Act চালু করে। এর মধ্যে কিছু Act নিম্নে দেওয়া হল-

i) Backing Sec. 66 IT Act.

ii) Pornography Sec. 67 IT Act.

iii) E-mail bombing sec. 66 IT Act.

iv) Virus Attacks sec. 43, 66 IT Act.

v) Logic bombs Sec. 43, 66 IT Act.

vi) Sending Threatening Massages by E-mail Sec. 503 IPC

vii) Sending defamatory Message by E-mail Sec. 499 IPC

viii) Bogus Websites, cyber fraudes sec. 420 IPC

ix) Web- jacking Sec. 383 IPC

x) E-mail, spoofing Sec. 463 IPC

এছাড়াও আরো অনেক ধরনে Act চালু রয়েছে, যেমন Reserve Bank of India Act 1934, IPC 1861, Bankers Books Evidence Act 1891, General clauses Act 1897 ইত্যাদি।

IT Act এর মাধ্যমে ২০১১ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষে মোট 24269 case registered হয়েছে এবং ১৪১৫২ ব্যক্তিকে arrest করা গেছে। অন্যদিকে IPC Act এর ধারায় 8054 case registered হয়েছে এবং ৬২৮৯ জন ব্যক্তিকে Arrest করা গেছে।

Cyber Crime জনিত শাস্তি ও জরিমানা :-

সারা বিশ্বব্যাপী Cyber Crime উত্তর উত্তর বেড়ে চলেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে এই ধরনের অপরাধীদের কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে কি? অবশ্যই শাস্তির ব্যবস্থা আছে, IT Act 2000, IPC এবং আরো অন্যধরনের Act অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের অপরাধের বিভিন্ন শাস্তি ও জরিমানা রয়েছে।

অপরাধ	শাস্তি
1. Hacking	1. তিন বছর পর্যন্ত জেল অথবা দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়ই।
2. Computer তথ্য চুরি, Computer System ভেঙে দেওয়া, Computer Source Code চুরি করা ইত্যাদি।	2. দুই বছর পর্যন্ত জেল অথবা দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়ই।
3. অন্যের লেখা তথ্য, প্রবন্ধ, গবেষণা জনিত ফলাফল নিজের নামে প্রকাশ করা।	3. দুই বছর পর্যন্ত জেল অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়ই।
4. Child পর্ণগ্রাফি তৈরী করা, exchange করা, femade Harrasment ইত্যাদি।	4. পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল এবং ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
5. Digital signature certificate জাল করা, জাল কার্ড তৈরী করা ইত্যাদি।	5. ১ বছর পর্যন্ত জেল অথবা ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়ই।

protection :

বিশ্বব্যাপী Cyber Crime যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে স্বাভাবিকভাবে ভয় হয় আমরা কি এই ধরনের crime থেকে মুক্তি পেতে পারি না? হ্যাঁ পারি। আমরা যদি একটু সর্তক ও পদ্ধতি মেনে চলি তাহলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই Cyber Crime এর কলার গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে পারি— নিম্নে কতকগুলি পদ্ধতি আলোচনা করা হল —

i) Operating System up-to-date :

Computer বা মোবাইলের operating system কে নির্দিষ্ট দিন অন্তর update করতে হবে- তাহলে আপনার system বর্তমানে সর্বাপেক্ষা protection -এ থাকবে। কারণ update না হওয়া system এর মধ্য দিয়ে Hacker রা খুব সহজে কাজ করতে পারে।

ii) Download -এ সতর্কতা :

কোনো file, document, video, game ইত্যাদি download করার আগে ভালো করে সতর্ক হোন, Anti -virus এর মাধ্যমে cheek করুন। সমস্ত দিক ঠিকঠাক থাকলে তবেই download করুন।

iii) Link ব্যবহার সতর্কতা :

e-mail, facebook, whatsapp মারফৎ অপরিচিত ব্যক্তি বা কোনো সংস্থার দ্বারা প্রেরিত link এ click করার ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। সন্দেহজনক, লাভজনক বার্তা প্রেরিত link এ click না করাই ভালো।

iv) System বন্ধ করার ক্ষেত্রে সচেতনতা :

আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে internet connection থাকা অবস্থাতেই computer বা মোবাইল বন্ধ করে দিই। প্রকৃতপক্ষে এই বন্ধ অবস্থাতেই Internet Active থাকে এবং এর ফলে বিভিন্ন তথ্য, file, code ইত্যাদি ট্রান্সফার করে নিতে পারে। সেইজন্য Internet Connection ভালভাবে disconnection করে system বন্ধ করা উচিত।

v) Pin Share না করা :

Computer password, E-mail password, mobile pin, debit/credit car pin, social security code, ইত্যাদি অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে share করা উচিত নয়। খুব যত্ন করে এবং safe জায়গায় গচ্ছিত করে রাখতে হবে।

vi) Slip ব্যবহারে সতর্কতা : on line কেনাকাটার slip, debit card slip, ATM ship, house rent slip ইত্যাদি গুলিকে হয় Safe জায়গায় গচ্ছিত রাখতে হবে না হলে একেবারে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

vii) চুরি/হারিয়ে যাওয়া documents এর ক্ষেত্রে সর্তকতা :

ATM Card, Bank Passbook, Mobile ইত্যাদি হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ ওগুলোকে Block করুন এবং issuing company -এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কারণ এই ধরনের documents থেকে অনেক ধরনের তথ্য Hacker -দের কাছে চলে যায়।

: মন্তব্য :

দিনের পর দিন আমরা নতুন নতুন এবং অপ্রত্যাশিত Challenge -এর মুখোমুখি হব। Cyber criminals এবং Cyber terrorists এর নতুন নতুন Technological development এবং তার অপপ্রয়োগে আজকের সমাজ ও জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই জন্য আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। শুধু নিজেকে সংঘবদ্ধভাবে সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। তবেই সুস্থ ও সুন্দর ভাবে Technology -এর আশীর্বাদ নিয়ে সামনের দিনে চরৈবেতির পথে এগিয়ে যেতে পারব।

ঝরা পাতা, কুঁড়ি ও মনোভাব

অধ্যাপক বিমল পাল
বাণিজ্য বিভাগ

দু-এক বছর আগে কলেজেরই বাৎসরিক পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম মন নিয়ে। তার আলো-আঁধারী গতিবিধি, মনের জানালা খুলে দিয়ে পরম আনন্দময় জীবন কাটানোর উপায় সম্বন্ধে। আবারও ফিরে এলাম মন নিয়ে, কারণ মন নিয়ে আমরা সবাই ভাবিত শুধুমাত্র আমাদের নিয়েই নয়, শিশুকাল থেকে কিশোর বা যৌবন বয়সকালেই মনের ঠিকমত লালন না করতে পারলে পরবর্তীতে আবার ভাল মনের মানুষ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হব। এই সময় আমাদের সমাজে বড় বেশী প্রয়োজন সু-মনের অধিকারী বালক-বালিকা বা অন্য কথায় বলতে ছাত্র-ছাত্রী। একটি শিশুর মন কি আপনা থেকেই ভাল হয়? না, ভালো মনের শিশু গড়ে তোলার জন্য চাই ভাল পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই পরিবেশগুলির ভারসাম্য যদি ঠিক ভাবে রক্ষা করা যায়, তাহলে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবেই বড় হতে থাকবে এবং মনটাও তৈরী হতে থাকবে, ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা একটু একটু করে তৈরি হবে। মনটাকে তৈরী করার জন্য প্রথমেই চাই ভাল মনের বাবা এবং মা, ভাল মনের শিক্ষক, বন্ধু, পাড়াপ্রতিবেশী।

কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় আর্থিক অনৈক্যের (Financial inequality) জন্য, সামাজিক পরিচিতির বিভিন্নতা হেতু কোন বাবা-মারই বোধ হয় মনটা ভাল নেই। আর মন যদি ভাল না থাকে তাহলে কোন কিছুই ভাল লাগে না। তাই পুত্রকন্যার প্রতি দরদী মনটাও হারিয়ে যাওয়ার ফলে তারা মানসিক ভাবে অবহেলিত হচ্ছে। এত গেল পারিবারিক কথা, বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে যেখানে ভালো মনের বিকাশ হবার একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র। একজন দরদী অনুভূতি সম্পন্ন একজন শিক্ষক হতে পারেন একটি ছাত্রের বিকশিত হবার মূল সোপান। নানাবিধ কারণের জন্য আজ বোধহয় শিক্ষকদের দরদী মনটাও হারিয়ে যাচ্ছে। তারা পড়ান, সিলেবাস শেষ করেন, পরীক্ষা নেন, মূল্যায়ন করেন কিন্তু সবই যান্ত্রিক। একটি আনন্দ মুখর শিক্ষকের সুখ সব সময়েই ছাত্র-ছাত্রীদের সমীহ আদায় করে, আত্মীকরণটাই হচ্ছে মূল কথা। ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তরের কথা, ব্যথা-বেদনা, ইচ্ছা অনিচ্ছার সংগে যদি শিক্ষক মহাশয়রা যুক্ত হতে পারেন, ছাত্র-ছাত্রীরাও মন খুলে কথা বলতে পারে। এখানেও বিশেষ করে মফস্বল ও গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা মন খুলে শিক্ষকদের সংগে মিশতে সংকোচ বোধ করে। শিক্ষকদের Status-এর সাথে নিজেদের মেলাতে পারেনা। একজন ধোপদুরস্ত শিক্ষক সহর থেকে পড়াতে এসে তাদের সাথে মিশতে একটু কুণ্ঠা বোধ করেন, এইখানেই শিক্ষক-ছাত্র দূরত্বের সৃষ্টি হয়, এই দূরত্ব কমাতে হবে শিক্ষকদেরই, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে টানতে হবে গল্প দিয়ে, খুব সহজ ভাষায় গল্প বলে। তারা যেটা শুনতে চায় সেই বিষয়গুলি উত্থাপন করলে ছাত্রদের মনে ভয়, ভীতি, শংকা দূর হয়ে যাবে।

আমার মনে আছে আমি যখন শিশু অবস্থায় একজন বয়স্ক মাষ্টার মশাই এর কাছে পড়তাম কয়েকজন মিলে, তখন উনি পাড়াতে পড়াতে, অংক করাতে করাতে নানা রকম প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতেন এবং বলতেন যে সঠিক উত্তর দেবে তাকে একটি টিকটিকির ডিম (এক প্রকারের লজেন্স) দেবেন। সত্যকথা সেই আকর্ষণেই আমরা পড়াতে আগ্রহ বোধ করতাম। বড় হবার পর যখন হাইস্কুলে গেলাম সেখানেও আরো কয়েকজন মাষ্টার মশাই পেয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রয়াত মন্ত্রী ভবানী মুখোপাধ্যায় অপরজন অংকের স্যার। সারাদিন বিভিন্ন ক্লাসে ক্লাসে

নিতেন এবং তার মাথা, চুল, হাত চশমা সাদা চকের গুঁড়োয় ভর্তি থাকতো। অংক আমাদের কয়েকজনের ভালোলাগতো না, আমরা শুধু তার থেকে গল্প শুনতে চাইতাম। তিনি সুন্দর করে শার্লক হোমসের ডিটেকটিভ গল্প বলতেন। তার একটাই দাবী অংক কর এবং গল্প শোনো।

কিন্তু কি আশ্চর্য গল্পের লোভ সামলাতে না পেরে রোজই অংক করতাম এবং এই ভাবেই তিনি আমাদের অংক ভীতি দূর করেছিলেন। গল্প করতে করতে যাঁরা পড়াতেন তাঁদের ক্লাসগুলোই ছিল প্রাণবন্ত। এখন এই গল্প বলা শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশঃ নিম্নগামী। বাড়ীতেও যারা গল্প বলবার জন্য বাবা, মা ছাড়াও পিসি, ঠাকুমা দাদু পেয়েছেন তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। শুধুমাত্র গল্প শুনেই মনের ভাব, কল্পনা, বিশ্বাস, বোধ, ভাল, মন্দ বিষয়গুলি তাদের মনের ভিতর গভীর ছাপ ফেলতো বলেই পরীক্ষাতেও তারা ভাল ফল করতো। বর্তমান যুগে বলার সেই লোকগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেল। এখন ছোটদের বড় হওয়া খুবই কঠিন এবং যান্ত্রিকতায় ভরা। আগে গল্প করে ছোটদের খাওয়ানো হতো। কিন্তু এখন সেই জায়গা নিয়েছে বোকা বাক্সর বিভিন্ন চ্যানেলের কার্টুন গুলো। দাদু, ঠাকুমা, পিসীদের ছেড়ে এখন তাদের সংগী হল ছোটা ভীম, টম অ্যান্ড জেরি। ফাঁকা অন্ধকার ঘরে বসে তারা টিভির দিকে অপলক চেয়ে থাকে। এখন টিভির স্ক্রীন টেনে নেয় আপনার ছেলে এবং মেয়েকে এবং একই সংগে তার মনকেও।

টিনেজার হতে থাকা এই ছেলে-মেয়েদের আনন্দ আর দুঃখ, রাগ আর হাসি, জানান দেয় ইমোটিকনের এক নূতনতর অবতার। গোল গোল চোখ এবং গোল গোল মুখ। এখন এরাই ফেসবুক, হোয়াটস্ এ্যাপে, মেসেঞ্জারে অনুভূতিই নাকি জানাচ্ছে। বন্ধুদের আসল মুখ হারিয়ে যাচ্ছে, স্থান নিচ্ছে ইমোটিকনের মুখ। বন্ধুদের এই মানবিক মুখগুলো হারিয়ে যাওয়া খুবই দুঃখের। একজন ভাল বন্ধু কত রকম ভাবে একজন ছেলেমেয়ের জীবনকে ভরিয়ে দিতে পারে তা বিভিন্ন সময় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা বলে গেছেন। গত কুড়ি বছর ধরে আসল মানুষগুলোর মুখ হারিয়ে যাওয়ার সংগে অনেক কিছুই কি আমরা হারাইনি! পাড়ার দাদা, দিদি, বৌদি, মাসিমা, মেসোমশাই, মোড়ের বেগার খাটার ছেলে সবই ভ্যানিস হয়ে যাচ্ছে। রক্তমাংসের এই মানুষগুলোর কোলে পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছিলাম, সকলের সুখ ও দুঃখকে ভাগ করে নিতে শিখেছিলাম। কারোর বিপদ আপদে পাড়ার সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়তাম প্রাণ দিয়ে। পাড়ার বড়োরা ছিল রক্তমাংসের মানুষ। তারা নানা গল্প বলতো, আমরা শুনতাম। যারা সত্য ও মিথ্যার তফাত বোঝাতে পারতো, সমাজে চলার পথের হদিশ দিতে পারতো। কিন্তু হায়, কি মিথ্যা মোহজালে জড়িয়ে আমরাই এখন একাকী পথ চলছি কি নিয়ে, শুধু কতকগুলো যন্ত্র নিয়ে আর মনে মনে ভাবছি আমার যেন কোন সমস্যা না থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সমস্যা আছে বলেই তো এই মানব জীবন। সমস্যা না থাকলে আমরা তো ভগবান হয়ে যেতাম। কত লোক হারিয়ে গেল, যাঁরা বিজ্ঞানের স্বপ্ন দেখাতেন, পাড়ার সেইসব স্যার, পাশের বাড়ির পন্ডিত ব্যক্তিটি। বাবা-মা বা জ্ঞান দাদারা যোগান দিতেন বিশ্বকোশ ধরনের বই, ডিকশনারী বা হত আমাদের সর্বক্ষণের সংগী। সেই সব বন্ধু এখন নেই যারা অনবরত যোগান দিত গল্পের বই। বইয়েরা গেছে, পাড়ার লাইব্রেরীগুলো ধুঁকছে, ওখানকার বইগুলো এখনও স্মরণ করায় কি মধুর জীবন, কত কি জানা, মনের মধ্যে নানা রকম স্বপ্নের জাল বিস্তার করা। আমাদের দেহে দুটি চোখ দিয়ে আমরা শুধু দেখি এবং সে দেখাও অতি বাস্তব। দেহের দুটি চোখ ছাড়াও মনেরও চোখ আছে কিন্তু সেই চোখ দিয়ে শুধু অনুভব করি, মনের জানালাকে আরো প্রসারিত করতে পারি। জ্ঞানী-গুণীরা প্রয়োজন মত মনের চোখ বাড়িয়ে-কমিয়ে দেখতে পারেন। যত জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করা যাবে, ততই মনের চোখ বাড়ানো যাবে। পৃথিবীর সব সভ্য জাতের পন্ডিতরা জ্ঞানের চোখের আলো প্রসার ঘটান বলেই আমরাও তাঁদের থেকে শিক্ষা নিয়ে

সকলের জ্ঞানের চাষ বিস্তার করার কাজে ব্রতী হই। প্রখ্যাত জার্মান মনিষী রাউন্ডি হ্যেসেল বলেছেন, সংসারের জ্বালা এড়ানো যায় মনের জগৎ তৈরী করে, তাতে ডুব দিয়ে। মনের জগৎ তৈরি করা যায় বই পড়ে। তাই ওমর খৈয়াম অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে বইকেও বলেছেন স্বর্গীয় বস্তু। কোরাণের বাণীতে আছে বই-এর কথা, বাইবেলের অর্থ হল বই, আর গণ দেবতা গণেশ মহাভারতের মতো বিশাল বই লিখেছেন নিজে। স্বাভাবিক ভাবেই মনুষ্য সমাজের কাছে বই এতটা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়কালে সমাজে মনের চোখ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অতি আবশ্যিক। সৃজনশীল (Creative), দূরদর্শীতা সম্পন্ন যত বেশী মানুষ আমরা পাব সমাজ ততটাই উপকৃত হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও সমৃদ্ধশালী হবে।

অতি যান্ত্রিকতার বিষময় ফল এখনই ফলতে শুরু করেছে। বর্তমানে শিশুমন অতি যান্ত্রিকতায় সার্বিক ভাবে লালিত হচ্ছে না। অতি শিশু অবস্থা থেকেই সে দেখেছে মা-বাবা সব সময়ই অতিব্যস্ত 'মুঠিফোন' (Cell Phone) নিয়ে। মা বাবারা সর্ব অবস্থায় মুঠি ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সন্তানদের ন্যায্য এবং প্রাপ্য সময় থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। নানাধরণের গল্প বলার পরিবর্তে শিশুকে মোবাইল দিয়ে, ছবি দেখিয়ে মন ভোলানোর এই নিদারুণ প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ কি ভাল ফল দেবে? আগে আমরা সংখ্যা গণনা শিখতাম ১,২,৩........ করে ১০০ পর্যন্ত। কিন্তু এখন শিশুকে শেখানো হয় উল্টো দিক থেকে গণনা করার পদ্ধতিও যেমন ১০০, ৯৯, ৯৮..... ১ পর্যান্ত। আগে তো আমরা ১ থেকে ১০০ পর্যন্তই শিখতাম, উল্টোটা শিখতাম না, তা বলে কি সবাই অংকে কাঁচা হত! আধুনিক পদ্ধতি কিন্তু শিশুর মনে (অবচেতন) বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে, সে শিখতে বাধ্য হচ্ছে, কিন্তু মন মানছে না, রেগে যাচ্ছে, কাঁদছে, চিৎকার করছে, অপর দিকে মা-বাবারা তা শেখাবেই। তফাৎ হল মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে শেখা, আনন্দ করে শেখা আর বাধ্য হয়ে শেখা। দুটো পদ্ধতির ফল কি এক হবে? মনে হয় না। আনন্দ করে বাবা-মার শেখানো, দাদু-ঠাকুমার গল্প, বন্ধুদের সাথে খেলার ছলে শেখা, আত্মীয় পরিজনদের মমতাময় আদর, এ সবগুলো এখন হারিয়ে গেছে। পরিবার এখন অণু পরিবার, সেখানে মা ও বাবা ছাড়া আর কেউ নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, বাড়িতে ও স্কুলে কঠোর অনুশাসনের মধ্যে বড় হচ্ছে শিশু, ভবিষ্যতে এরা যখন বড় হবে, মানুষ হবে তার ফলশ্রুতি কি খুব স্বাভাবিক হবে? জেদী, স্বার্থপর, ভোগ-বাসনাময় পূর্ণ একটি মানুষ, যে সমাজ বোঝে না, বাবা-মাকে বোঝেনা, সামাজিক দায়-দায়িত্ব বোঝে না, অপরের বিপদে পাশে থাকার কথা ভাবতে পারে না- এই রকম একটি শিক্ষিত মানুষ হবে, যার কাছে যন্ত্রই সব। মায়া-মমতা, হৃদয়, বিবেচনা, দায়িত্ব কিছুই থাকবে না।

এর থেকে কি পরিত্রাণের কোন রাস্তা নেই? অবশ্যই আছে, কিন্তু তার জন্য নিজেদেরকেও কিছু ত্যাগ করতে হবে। কিছু কিছু সুঅভ্যাস রপ্ত করতে হবে। যেমন;

নিজের বাবা মাকে সংগে রাখতে হবে ছেলে-মেয়ের স্বার্থেই।

- দাদু-ঠাকুমার সংগে মিশতে দিতে হবে গল্প শোনার জন্য।
- স্মার্ট ফোন ত্যাগ করতে পারলে ভালো নতুবা তার ব্যবহার দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ছেলেমেয়েদের চোখের আড়ালে করতে হবে।
- মা-বাবাকে বেশী বেশী করে সন্তানদের জন্য সময় দিতে হবে।
- খেলার সময় খেলতে দিতে হবে, ছেলে-মেয়ে মানুষ করার নাম করে খেলা বাদ দিয়ে সেই সময় পড়ানো চলবে না। একটু বড় হলে মাঠে যেতে দিতে হবে।
- লেখা-পড়া করার সংগে ভালো গল্পের বই দিতে হবে। পাড়া বা এলাকায় যদি কোন গ্রন্থাগার থাকে তবে তাতে তার নাম নথিভুক্ত করতে হবে।
- বাড়িতে টিভির সংগে যুক্ত করাতে হবে চার অথবা পাঁচটি চ্যানেল। সেগুলি হবে বাংলা ও ইংরাজী খবরের জন্য একটি হবে ভালো কার্টুন চ্যানেল, Animale Planet

এবং একটি ভালো বিদেশী চ্যানেল।

- বারো ক্লাস পাশ করার পর সেল্ ফোন দিতে হবে। তার আগে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সাধারণ ফোন দিতে পারা যায়।
- পুত্র-কন্যাদের ক্লাস rank করার জন্য অযথা মানসিক চাপ দেওয়া যাবে না, মনে রাখতে হবে মাত্র একজনই প্রথম হবে, তার ইঁদুর দৌড়ের কোন প্রয়োজন নেই।
- ভালো চাকরী, ভালো মাইনেটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হল ভালো মনের মানুষ হওয়া, জীবন শুধুমাত্র নিজের জন্যই নয়, অপরের জন্যও কিছু করার।

জীবনে চলার পথে আমরা প্রত্যেকেই চাই সকল বিষয়ে ১০০ শতাংশ সফলতা। সেটা করার জন্য আমরা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাই কিন্তু লক্ষ্যে পৌছান খুব সোজা কথা নয়। আদি ব্যবস্থাপনায় গুরুরা অনেক কথাই বলেছেন এবং সেগুলিকে আমরা মান্যতাও দিই। যেমন কঠোর পরিশ্রম, জ্ঞান, ভালোবাসা, ভাগ্য, অর্থ নেতৃত্বদান, অনুপ্রাণিতকরণ প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর আমরা গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। বর্তমানে ব্যবস্থাপনা গুরুরা একটি নূতন বিষয় "Attitude" বা মনোভাবের কথা বলেন। প্রতিটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোভাবকি, তার ওপর নির্ভর করে সাফল্যের মাত্রা। ছাত্রাবস্থা থেকেই যদি তাদের বোঝান কোন কাজের আগে মনোভাব (Attitude) গড়ে তোলার কথা, তাহলে, দৃঢ় ও সাবলীলতার সাথে উদ্দেশ্য পূরণে অগ্রসর হতে পারবে। সদর্থক (positive) চিন্তা ভাবনা করতে হবে, নেতিবাচক চিন্তাধারার কোনস্থান নেই। এক কথায় মনোভাব গড়ে তুলতে হলে প্রথম থেকেই তাকে লালন করতে হবে, তবেই জীবনের চলার পথে বাধা-বিঘ্ন অনেকটাই দূরীভূত হবে।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজ থেকে অনেক কিছুই নিয়ে থাকি, কিন্তু সমাজকে কতটুকু দিই, দেওয়ার পাল্লা যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আসুন না আমরা সকলেই প্রতিজ্ঞা করি, আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, কিন্তু দিতে পারিনি কিছুই, আমাদের ছেলে মেয়েরা যাতে কিছু দিতে পারে এই সমাজকে সেই মহান শিক্ষা দিয়ে যাই। তবেই তো আমাদের মন হালকা হবে, জীবন সার্থক হবে এবং সমাজটাও হবে অনেক সুখী সমাজ।

কলেজের এন.সি.সি. বিভাগ

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক, হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি, বীরভূম

সে দিনটা ছিল ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসের কোনও একটা দিন। কলকাতা বইমেলায় কিছু বই কিনতে গিয়েছিলাম। বইমেলায় বই কেনাকাটা করাটা ছিল আমার কাছে নতুন উপভোগ্য ও মজার বিষয়ও বটে। স্টলে স্টলে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন লেখকের এবং বিভিন্ন প্রকাশনার ভিন্ন ভিন্ন ছাদের বই দেখার আনন্দ ছিল আমার এক অসাধারণ তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা।

সে যাই হোক, বিভিন্ন স্টলে স্টলে ঘুরে ঘুরে বই দেখতে দেখতে কখন যে বই-এর জগতের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম তা আমি বুঝতেই পারিনি। অতঃপর আমার যখন সম্বিত ফিরল তখন বুঝতে পারলাম যে অনেকটা দেরী হয়ে গিয়েছে। কি আর করা যাবে, মেলার ভিড় ঠেলে বাইরে বেরলাম। এবার বাস ধরার পালা। বাস যদিও বা পাওয়া গেল তো বাস মোটেই এগোয় না। তখন মনে মনে কেবল ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলাম, যাতে করে নির্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছতে পারি। শেষমেষ অনেক কষ্টে কলকাতা শহরের নিত্যনৈমিত্তিক ট্রাফিক জাম ঠেলে কোনওমতে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম, পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার ঘোষণা হল। শীতের রাত্রি, এমনিতেই অত রাতে লোকজনের তেমন আনাগোনা নেই বললেই চলে। ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ঢুকতেই একটা পছন্দসই বসার জায়গা পেলাম। এরপর ট্রেন অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে শুরু করল। একটু যায় আর একটু করে থামে। এই রকম ভাবেই ট্রেন টিকিয়াপাড়া স্টেশনে ঢুকলো। ঘড়ি দেখলাম। প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় নিল। একে অত রাত্রি তার উপর আবার ট্রেন লেট করল; সবমিলিয়ে চিন্তায় চিন্তায় মনের ভিতরটায় কেমন যেন এক অজানা অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কি আর হবে? যা ভাগ্যে আছে তাই ঘটবে, এই ভেবে নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। টিকিয়াপাড়া থেকে বেশ কিছু যাত্রী উঠল, তাদের দেখে মনের ভিতর খানিক স্বস্তি এল। ট্রেনের সব যাত্রীই বসার জায়গা পেলেন কারণ অত রাত্রে ট্রেন ফাঁকাই ছিল। আমার সিটের ঠিক উল্টোদিকে এ নবদম্পতি বসল। কথায় কথায় জানতে পারলাম যে তা কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে ফিরছেন, বাস বন্ধ থাক জন্য তাদেরও ট্রেন ধরতে বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিল। গ করতে করতে ট্রেন চেঙ্গাইল স্টেশনে এসে গেল। ত ঘড়িতে সময় দেখলাম রাত ১০:৪৫ হবে। চেঙ্গাইল স্টে থেকে কিছু যুবক খানিক অসংলগ্ন অবস্থায় ট্রেনে উ পড়ল। তারা নিজেদের মধ্যে অশালীন ভাষায় বাক্যাল করছিল। তা দেখে মনে মনে ভয়ও হচ্ছিল। হঠাৎ ওদ লক্ষ্য পড়ল আমার উল্টোদিকে বসা মূল্যবান সোন গয়নায় সুসজ্জিতা ঐ ভদ্রমহিলার উপর। প্রথমে সে মহিলাকে উদ্দেশ্য করে কটূকথা ও অভব্য আচরণ কর শুরু করল। তারপর ওরা ছুরি বের করে ঐ ভদ্রমহিলা ভয় দেখিয়ে তার সমস্ত অলংকার খুলে দেবার জ জোরাজুরি করতে লাগল। সেই মহিলাও অপ্রস্তুত হ করতে লাগলেন এবং বারবার তাদের কথা প্রত্যা করতে লাগলেন। সে এক বিশ্রী অবস্থা। তখন উভয়পক্ষ মধ্যে কথা কাটাকাটি চরম আকার নিল। কিন্তু এক ভদ্রমহিলা কতক্ষণই বা এই অভব্যতা সহ্য করতে পারে ট্রেনের ঐ কামরার অন্যান্য যাত্রী এবং ঐ ভদ্রমহি স্বামীও সেই পরিস্থিতিতে হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূ প্রত্যেকে একে অপরের মুখ চাওয়াচাইয়ি করছেন।

এইরকম পরিস্থিতিতে আমারই পাশে বসা এক ঐ মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন —'মা, তুই সমস্ত গহনা ওদের দিয়ে দে। তোর প্রাণ আগে ন সামান্য কটা গয়না আগে? তাছাড়া ওগুলো তো

ইমিটেশনের গয়না, তুই ওগুলো ওদের দিয়ে দে তো। তোকে আমি আবার সব গয়না গড়িয়ে দেবো। তুই শুধু শুধু জেদাজেদি করিস না তো; দিয়ে দে বলছি।

বৃদ্ধের এই কথায় ট্রেনের উপস্থিত যাত্রীগণ ও ঐ ভদ্রমহিলা কেউ কোন প্রতিবাদ বা অন্যকোন কথা বলল না। সবাই নিশ্চুপ রইল। ঐ মহিলা সেই বৃদ্ধের এককথায় সমস্ত গয়না খুলে ওদের দিতে গেল। ততক্ষণে ট্রেন ধানবাদে ঢোকে ঢোকে অবস্থায়। যাই হোক ঐ বৃদ্ধের কথার প্রকাশ ভঙ্গিমায় ও সেই ভদ্রমহিলার তৎপরতার সঙ্গে গয়না খুলে দিতে যাবার আকস্মিকতায় ও অন্যান্য যাত্রীগণের নীরবতায় দুষ্কৃতীদলের মনের মধ্যে কি জানি কি এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল যে, তারা কিছু না নিয়েই ট্রেন থেকে নেমে গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ঐ ভদ্রমহিলার সমস্ত গয়নাই ছিল সোনার ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরের।

বলাইবাহুল্য যে সে যাত্রায় সেই ভদ্রমহিলাসহ ট্রেনের সকল যাত্রীগণ রক্ষা পেল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আমি তখন মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে স্বয়ং ভগবানই তাঁর দূত হিসাবে ঐ বৃদ্ধকে পাঠিয়েছেন ঐ ভদ্রমহিলাসহ ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীগণকে রক্ষা করার জন্য। সবাই সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তারিফ করে তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলেন। অতঃপর সেই বয়স্ক ভদ্রলোক ঐ মহিলাকে এরপর থেকে মূল্যবান গয়না না পরে বাইরে বেরনোর পরামর্শ দিলেন এবং যেকোন বিপদকালে অযথা উত্তেজিত না হয়ে, ভয় না পেয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগের কথা বললেন।

এদিকে আমার গন্তব্যস্টেশন দেউলটিও এসে গেল। আমিও আর একবার সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। মনে মনে বললাম হে ঈশ্বর! খুব বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে। তোমার অপার দয়া।

সেদিন যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম তা আজও আমার মনের মণিকোঠায় সজীব হয়ে আছে।

পরিশেষে বলি যে, লেখক না হয়েও নিজের অভিজ্ঞতা সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়ার যে ধৃষ্টতা দেখালাম তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার জন্য পাঠকদেরকে আমার ঐকান্তিক ও হার্দিক অনুরোধ জানালাম।

কলেজের এন.এস.এস. বিভাগ

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা

স্বপন সাহা

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজীব বলা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় কেন? প্রত্যেক জীবের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তার কতগুলি Biological instinct আছে। এর প্রভাবে জীব আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা মূলক জৈব উদ্দেশ্য সাধন করে। জন্ম মৃত্যু পর্যন্ত জীবন চক্র পরিচালিত হয়। কিন্তু এই Biological instinctএর বাইরে মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে জীবকূলে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। অন্যান্য জীবের থেকে তাকে পৃথক করেছে। এখন প্রশ্ন হল সেটি কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে intellect এবং imagination।

এই intellect এবং imagination-এর পুষ্টির জন্য চাই শিক্ষা। মনুষ্যেতর সব প্রাণীর কেবলমাত্র শারীরিক পুষ্টির প্রয়োজন কিন্তু মানুষের শারীরিক ও মানসিক এই উভয় প্রকার পুষ্টিরই প্রয়োজন। মানসিক পুষ্টির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। এখন প্রশ্ন হল, শিক্ষা কাকে বলে? শিক্ষা সম্পর্কে জগতের চিন্তানায়করা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের মত এমন সার্বিক ধারনা কেউ দিতে পারেনি। স্বামীজীর মতে, "Education is the manifestation of the perfection already in man" তার মতে জ্ঞান মানুষের অন্তরের জিনিস। বাইরে থেকে জ্ঞান আসে না। মনের মধ্যে থেকে যখন আবরণকে আমরা সরিয়ে দিতে পারি, তখন আমাদের আত্মজ্ঞান প্রকাশ লাভ করে। চকমকি পাথরের মধ্যে আগুনের জ্বলার সম্ভাবনা আছে বলেই ঘর্ষণের ফলে তা জ্বলে ওঠে। আগুন বাইরে থেকে আসেনা। মনের মধ্যে জ্ঞানের উৎস আছে বলেই তা প্রকাশ পায় অনুধাবনের মাধ্যমে। তাই তার মতে শিক্ষা হল আন্তরিক সত্তার প্রকাশ। বাইরের কোন প্রভাব... এবং এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে।

বিবেকানন্দ প্রকৃত শিক্ষার সাজ্ঞা ... নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে শিক্ষায় ... নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারা যায়। সেই ... শিক্ষা। আজকাল এইসব স্কুল কলেজে পড়ে তোম... এক প্রকার একটা dyspeptic জাতে তৈরী ... স্বামীজী আরো বলেছেন, "কেহ কতকগুলি পরীক্ষা ... করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে পারিলেই তোমরা ... শিক্ষিত মনে কর। যাহা জনসাধারণকে জীবন সংগ্রামে ... যোগ্য হইতে সহায়তা করে না, তাহাদের মধ্যে চরিত্র... লোকহিতৈষণা এবং সিংহের মত সাহস উদ্বুদ্ধ কর... তাহা কি শিক্ষা নামের যোগ্য?" ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ নিয়... করিয়া ফলপ্রসু করিয়া শক্তি অর্জন করাই প্রকৃত শি...

স্বামীজী শিক্ষার যে পরিপূর্ণ একটি রূপরেখা ... করেন তাহল—"মানুষের মধ্যে পূর্ণতা স্বতঃই ... তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা।.... শিক্ষা বলতে ... বুদ্ধি যথার্থ কার্যকর জ্ঞান অর্জন, বর্তমান পদ্ধতি ... পরিবেশন করে তাহা নয়। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা ... না। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার যাহার দ্বারা ... গঠন হয়। মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশি... এবং মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে। তাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ... সহিত বেদান্তের সমন্বয় ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস ... সেই শিক্ষার মূলমন্ত্র।"

বিবেকানন্দ বলেছেন, "শিক্ষার আসল লক্ষ্য ... মানুষ গড়ে তোলা আর এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ... শিক্ষার জাতীয় ভিত্তি, জাতীয় মাধ্যম এবং ...

পরিবেশ।" স্বামীজীর উপদেশ হল —"সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। তাহারা অনেক বিষয় অবগত হউক।" বেলুড়ে EMI School এবং পুরুস্কার বিতরণী সভার সভাপতি হিসাবে যে বক্তৃতাটি বিবেকানন্দ দেন এবং পরে যা 'Indian Mirror' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাতে শিক্ষা সম্পর্কে তার মনের কথাটি ধরা পড়ে—"আধুনিক ছাত্রদের ব্যবহারিক বিষয়ে জ্ঞান নেই। সে নিতান্ত অসহায়ের মতো। আমাদের ছাত্রদের দরকার যত না পেশীর সৌষ্ঠব তার চেয়েও বেশি কষ্টসহিষ্ণুতা। তারা আত্মনির্ভর নয়। তারা নিজের চোখে দেখে না, নিজের হাতে কিছু করে না। আজকালকার ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা নিছক পুঁথিগত। কিন্তু ছাত্রদের অবশ্যই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং স্বহস্তে কাজ করতে শেখাতে হবে। হাতে কলমে শিক্ষার অর্থনৈতিক উপযোগিতার দিকতো আছেই অধিকন্তু ওটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা।" বিবেকানন্দ আবার বলেছেন, "যে শিক্ষা তাদের হচ্ছে তা আংশিক। এ শিক্ষা তাদের দুর্বল করছে। তিলে তিলে মেরে ফেলছে। রাশীকৃত অসার জিনিস শিশুদের মগজে ঠেসে ঢোকানো হচ্ছে। তাদের ৬০-৭০ জনকে একটা ক্লাসে পুরে ৫ ঘন্টা আটকে রাখা হচ্ছে।" শিশুকে শিক্ষা দেবার সময় তার গ্রহণ সামর্থ্যের যে নিয়ম আছে তা অবশ্যই পালন করতে হবে। আমাদের ধৈর্য শিখতে হবে।

"যত স্ত্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা"—রামকৃষ্ণের এই বাণী অন্তরে বহন করে বিবেকানন্দ জানিয়ে ছিলেন —"যে দেশে যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ সে জাত কখনও বড় হতে পারে নি..." তাই মাতৃজাতির উন্নতির ব্যাপারে তার আকুলতার শেষ ছিলো না। তিনি এদেশের সমাজকে নারীদের ছাড়া একপক্ষ পাখীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। উন্নতির প্রগতির আকাশে ওড়া কখনই সম্ভব নয় একটি মাত্র পক্ষ নিয়ে। তাই স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উন্নতি দরকার। আমেরিকার শিক্ষিত স্বাধীন চেতা নারী সমাজ তাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি বলেছিলেন—"এ (আমেরিকা) নারীদের যেন স্বর্গস্বরূপ।" বিবেকানন্দ বুঝে ছিলেন ভারতীয় জনগণের তথা নারী সমাজের মুক্তির পথ হল শিক্ষা।

বিবেকানেন্দের নিজের চরিত্র ছিল বহুমুখি হীরকখন্ডের মত। তিনি চেয়েছিলেন সমাজেও সেইরকম মানুষ তৈরি হোক। তাই তিনি সকলকে প্রার্থনা করতে বলেন—

"হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমার মনুষ্যত্ব দাও। মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ কর।"

আমাদের অলসতা, কর্ম বিমুখতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, দুরকম। আমরা যেন সত্ত্বঃ গুণের প্রভাবে জড়ত্বকে ও পশুত্বকে জয় করতে পারি। আমরা যেন হয়ে উঠতে পারি মানুষরূপী দেবতা। আমরা যেন আমাদের নিজের অভ্যন্তরস্থ বিশাল দেবত্বের শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারি। আমরা যেন সকলকে আপন ভাবতে পারি। যেন ত্যাগে সমর্থ হতে পারি, যেন পরের জন্য আত্ম বলিদানে সর্বদা প্রস্তুত —এমন মানুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারি। তবে এসবের মূলে হল প্রকৃত শিক্ষা। কেননা প্রকৃত শিক্ষা মানুষের ভিতরকার দেবত্বকে বিকাশ করে। স্বামীজী সেই শিক্ষার কথা বলেছেন যাতে চরিত্র তৈরি হয়, মনে শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, শ্রদ্ধাবান হতে শেখায়। কিন্তু বর্তমানে সেই শিক্ষা হয়তো আমাদের মধ্যে নেই। তাই মহাশক্তির কাছে একমাত্র প্রার্থনা—'আমায় মানুষ কর।'

বিবেকানন্দের ধারণায় শিক্ষা শুধুমাত্র সমাজবিজ্ঞান বা দার্শনিক বা জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখার ব্যাপার নয়। মানুষের অস্তিত্বের মূলে এর অবস্থান। স্বামীজী সেই শিক্ষার কথা বলেছেন, যার অমৃতস্পর্শে সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা, আঁধার হয়ে যাবে আলো। সূর্যের দিকে যাদের মুখ তারা কখনো ছায়া দেখে না। সেই জন্যই তো বিবেকানন্দ এমন শিক্ষায় কথা বলেছেন 'যা অসৎ থেকে সতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে নিয়ে যাবে।'

প্রত্নতত্ত্বে সুন্দরবন

সুকুমার মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ

ভূমিকা :- ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের সুন্দরবন অরণ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশিষ্টতায় সমস্ত পৃথিবীতে সুপরিচিত। সুন্দরবন অঞ্চলের সমূদ্র উপকূলবর্তী প্রায় ২০,০০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে আনুমানিক ২১°৪০' দঃ থেকে ২২°৪০' উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৮° থেকে ৭১°৩০' পূঃ দ্রাঘিমাংশ রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে সাধারণ ভাবে বনাঞ্চলকে ম্যানগ্রোভ নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ভারত ও বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীতে বর্তমানে যে সব অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ আছে, সেই সমস্ত অঞ্চলগুলি হল, পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, ব্রাজিল, ফ্লোরিডা, মেক্সিকো, মাদাগাস্কার, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়, সুমাত্রা, ভিয়েতনাম, সাউথ চায়না, পূর্ব পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপিন্স ইত্যাদি।

এই অঞ্চলের উদ্ভিদ যেহেতু ম্যানগ্রোভ বাস্তু রীতি পর্যায়ের। কারণ কম থেকে বেশি লবনাক্ত জলের পরিবেশে জন্মায়, সেই কারণে এইসব গাছে পরিবেশ অনুযায়ী বিশেষ কিছু বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ গঠনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সেই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য লবনাম্বু এই উদ্ভিদগুলিকে মিষ্টি জলের উদ্ভিদের সঙ্গে আলাদা করা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এইসব গাছ স্বাভাবিক মূলের পরিবর্তে শ্বাসমূল, ঠেসমূল ইত্যাদি থাকে। তাছাড়া এই সব লবনাম্বু উদ্ভিদের বীজ ধারণ ও অঙ্কুর হওয়ার পদ্ধতিও মিষ্টি জলের গাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল যদিও এক অতি কঠিন পরিবেশে যেমন সমুদ্রের সুউচ্চ ঢেউ, উপকূলের ঝড় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি বৃষ্টিপাত, লবানাক্ত আবহাওয়া, জল, মাটি এবং দৈনিক জোয়ার ভাটার প্রভাবের মধ্যে থাকে... পৃথিবীর বুকে আমাদের সুন্দর বনের মতো ম্যানগ্রো... বনের আস্তিত্বের প্রমানা তথা প্রায় ১৩ কোটি বছর ... পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই প্রমাণ্য তথ্য জীবাশ্ম... শিলাস্তরে সংরক্ষিত আছে। ভারতবর্ষে ম্যান... বনাঞ্চলের প্রাচীনতম তথ্য এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে... শিলাস্থর থেকে আনুমানিক ৭ কোটি বছর আগে... অন্তক্রিটেসিয়াম সময়ের পুরানো শিলাস্তরে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ সুন্দরবনের প্রাচীনতম প্রমাণ ১ কোটি বছর আগে থেকেই পাওয়া যায়। তবে ৭ কোটি বছর আগে এই বনাঞ্চলের অবস্থান এখনকার জায়গায় ছিল না।

সুন্দরবনসহ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের অবস্থান যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বদ্বীপ অঞ্চলে সৃষ্টি হয়। পূবভারতীয় উপমাহদেশের ভূতত্ত্বীয়, ভৌগোলিক বিবর্তনের কারণে বদ্বীপ অঞ্চলের স্থান পরিবর্তন হেতু ম্যানগ্রোভ বনের অবস্থান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবির্তিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম সুবিশাল বঙ্গীয় অববাহিকা বৈজ্ঞানিক ভাবে যে অঞ্চল Bengal Basin নামে পরিচিত তা উপকূলের সুন্দরবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বঙ্গীয় অববাহিকার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। এই সুবিশাল বঙ্গীয় অববাহিকার জন্ম ও ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে।

পুরা উদ্ভিদ প্রমাণ অনুসারে সুন্দরবনের অবস্থান নির্ভর যৌজ ৭ কোটি বছর আগে শিলাস্তরে বঙ্গীয় অববাহিকা বোলপুর, বর্ধমান, ঘাটাল, জলঙ্গী, ...

অঞ্চলে পাওয়া গেছে। সাত কোটি বছর আগে প্রথম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের সন্ধান পাওয়া যায় আজকের গোলপাতা গাছের রেণুর জীবাশ্মের প্রমান্য তথ্য থেকে। হিমালয়ের উত্থানের জন্য বারে বারে টেকটনিক মুভমেন্ট হয়েছে। তার প্রভাবে বঙ্গীয় অববাহিকার অভ্যন্তরে সমুদ্র প্লাবন হয়েছে। ৫.৫- ৫ কোটি বছর আগে ইয়োসিন অধিযুগে সমুদ্র উপকূল সহ সুন্দরবন অঞ্চল বর্তমান দুর্গাপুর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল তার প্রমান্য তথ্য গোলপাতা গাছের রেণু সহ অন্যান্য গাছের রেণু যেমন কেওড়া, গর্জন থেকে জানা যায়। এরপর ৩.৫- ৩ কোটি বছর আগে ওলিসোসিন সময়ে দুর্গাপুর অঞ্চলে পুরো অনুজীব বিশ্লেষণ দ্বারা মিষ্টি জলের গাছের রেণুর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে সমুদ্র উপকূল অনেক দক্ষিণে চলে গিয়ে ছিল।

সমস্ত পৃথিবীতে পুরা উপকূল খনিজ তেল পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। পুরা উপকূল অঞ্চলের পুরা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ সমূহ ও সমুদ্র উপকূলের কন্টিনেন্টাল শেলফ বা মহীসোপান অঞ্চলের পুরা জীব সমূহের জৈব ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর অন্যতম মূল্যবান খনিজ তেল পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়েছে। সেই কারণে পুরা উদ্ভিদ বিদ্যার বিশ্লেষণ দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে পুরা ম্যানগ্রোভ অঞ্চল এবং পুরা উপকূল অঞ্চলের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। পুরা সমুদ্র উপকূলের এবং পুরা সুন্দরবনের বঙ্গীয় অববাহিকায় অবস্থানের সময় ও স্থানের যথার্থ মূল্যায়ন দ্বারা এই অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের খনিজ তেল সন্ধানের জন্য এখন পর্যন্ত যে তৈলকূপগুলি খোঁড়া হয়েছে তার শিলাস্তরের বিশ্লেষণ করে এবং এই সব শিলাস্তরের জীবাশ্মের প্রামাণ্য তথ্য বিশ্লেষণ করে বিগত ৭ কোটি বছর থেকে আনুমানিক বিগত ৫০ লক্ষ বছর পর্যন্ত পুরা সমুদ্র উপকূল এবং সুন্দরবনের ভূতত্ত্বীয় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে।

কোলকাতা, দমদম, কোলাঘাট অঞ্চলের মাটির নীচের স্তরের জীব জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বোঝা গেলো যে আনুমানিক ১০,০০০ বছর আগে এইসব অঞ্চল শুকনো ডাঙ্গা ছিল। অন্তঃ প্লায়স্টোসিন অর্থাৎ ১৪,০০০ থেকে ২০,০০০ বছরের মধ্যে Transgressive cycle আরম্ভ হওয়াতে সমুদ্র ধীরে ধীরে উপমহাদেশের দিকে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করল। সমুদ্রের উপমহাদেশের দিকে অগ্রগতির কারণে কোলকাতা সহ অঞ্চলের মিষ্টি জলে লবানাক্ত জলের প্রভাব বাড়তে লাগল।

আবার ৭০০০- ৬৫০০ বছর সময়কালে সমুদ্র উপকূল সহ সুন্দরবন কোলকাতা, দমদম, কোলাঘাট, ব্যারাকপুরের উত্তরে বিস্তৃত হল। অর্থাৎ আজকের সুন্দরবন বিগত ১৪০০০ থেকে ৭০০০ - ৬৫০০ বছর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কখন সমুদ্রের দিকে আবার কখনও উপমহাদেশের অবস্থান যে অন্তঃ প্লারস্টেসিন সময়ে বর্তমান অবস্থান থেকে অন্তত ৪০-৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে ছিল তার প্রমান্য তথ্যও পাওয়া গেছে। সুন্দরবনের মতো ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বিগত ৭ কোটি বছর থেকে বিভিন্ন ভূতত্ত্বীয় যুগে বঙ্গীয় অববাহিকার বিভিন্ন অঞ্চলে চলাচল করেছে। প্রত্নজীববিদ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে বর্ধমান, দুর্গাপুর, অঞ্চলে, এমনকি ভুটান দার্জিলিং হিমালয়ের পাদদেশও চিহ্নিত করা গেছে।

সুন্দরবনের এই চলাফেরার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এখনও অব্যাহত আছে। প্রত্নজীববিদ্যার বিশেষজ্ঞ দ্বারা বর্তমানের উপকূলবর্তী অঞ্চলের মাটির নীচের স্তর থেকে উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবের অনু বিশ্লেষণ এই বনের চলন প্রক্রিয়া, বর্তমান সময়ে সমুদ্র জলস্তরের ওঠা অথবা নামা এবং Transgression অথবা Regression সম্পূর্ণ সঠিক ধারণা নির্ধারণে সাহায্য করবে।

নারী কি স্বাধীন

কাজী সাহিনা খাতুন
বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ

শাহবানু থেকে ইমরানা, দুই দশক কেটে গেল। আরও কতদিন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় থাকতে হবে? কতটা শতাব্দী পথ পেরোলে তবে.....।

মহাভারতের একটি কাহিনীতে দেখা যায় ভঙ্গাস্বন নামে এক রাজা শাপগ্রস্ত হয়ে নারী হয়ে গিয়েছিলেন। এক ঋষিবধূর জীবনযাপন করতে হল তাকে। দীর্ঘদিন পর শাপমুক্তির সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি তাঁর নিজস্বতা ফিরে পেতে চান কিনা। তিনি জানান, তাঁর নারী জীবন সেই রাজত্বের থেকে অনেক বেশি লোভনীয়। তিনি নারীই থাকতে চান।

নারীর জীবনে সত্যিই আছে এক দুর্লভ মায়াবী ছন্দ। তার কারণ নারী সন্তানকে ধারণ করে। পালন করে, নারী প্রেরণা দেয়, নারী শুশ্রূষা করে, আবার প্রয়োজনে নারী নিজের ব্যক্তিত্বকে নিঃশেষে মুছে দিতে পারে অন্যের জন্য। স্বার্থত্যাগ করতে পারে আমূল। নারী নির্ভর খোঁজে, আশ্রয় চায় পুরুষের কাছে, আবার নিজেই আশ্রয় হয়ে ওঠে। নারী সৃষ্টি করে আবার নিজে প্রেরণা হয়ে ওঠে সৃষ্টির। এই পরস্পর বৈপরীত্য নারী পরিপূর্ণতারই উপাদান। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মনে আসে একটা প্রশ্ন তা হল নারী কি স্বাধীন? স্বাধীনতার হলুদ রঙ গায়ে চড়িয়ে নারী কি ভেসে বেড়ায় মুক্ত বাতাসের মতো। নাকি আজও কোথায় আটকে আছে সে। গুমরে মরে সে অন্ধকারে। হয়তো বা স্বাধীনতার ভান ধরে?

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত জলগাঁও-এ মুসলিম সমাজের মেয়েরা হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে পারত না। ২২ বছরের এক তরুনী হঠাৎই—এই সনাতন ভাবমূর্তিতে আঘাত হানল। বেশ কিছু মহিলা জড়ো করে সিনেমা হলে চলে সিনেমা দেখতে। পরিনামে বাড়ি ফেরার পথে প্রচুর ইট-পাটকেলের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, মেয়ের দলটিকে। তবুও মানেনি সে। মুসলিম মেয়েদের স্বাধীনতা ও সামাজিক অধিকারের জন্য আজও লড়াই চালাচ্ছে সে। কাগজ খুললেই চোখে আসে এরকম নানা ঘটনা। এছাড়াও ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ, ইভটিজিং কি নেই। মেয়েদের উপর অত্যাচারের বহর বেড়েই চলেছে। শুধু কি তাই, তাদের চলাফেরা, কথাবার্তা এমনকি পোশাক-আসাকের উপরও বাধানিষেধ। 'স্বাধীনতা', 'স্বাধীনতা' করে যতই চিৎকার হোক না কেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা কিন্তু আজও আঁধারে। এমনিও অধিকাংশ মেয়েই আইনগত অধিকার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। মুখবুজে মেনে নেয়। সে যে কারণই হোক স্বামীর অত্যাচার, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, অপমান, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। ভাবলে দুঃখ হয় গর্ভস্থ ভ্রূণ কন্যাসন্তান হলে মায়ের স্বাধীনতা নেই তাকে বাঁচিয়ে রাখার। অনেক ক্ষেত্রে নারীর সন্তান ধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মূল্যই দেওয়া হয় না। যেমন ভাবে সংসারে তাকে দাবিয়ে রাখা হয়, তেমনই তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাললাগা-মন্দ লাগা, তার চাহিদা, তার আকাঙ্ক্ষা সব কিছু চাপা পড়ে থাকে নীরবে যন্ত্রণার অন্তরালে। 'স্বাধীনতা' শব্দটা তার কাছে হাস্যকর মনে হয় তখন। স্বাধীনতা আসলে কী? একটা মৌলিক অস্তিত্ব বা মৌলিক চেতনার নামই স্বাধীনতা। যা প্রতিটি নারীর ভেতরেই থাকে শুধু তাকে জাগানোর অপেক্ষা। চেতনা বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সচেতন সেই স্বাধীন। নিজস্ব সংস্কারের পরাধীনতা থেকে যখন সে বেরিয়ে আসতে পারে তখই সে স্বাধীন। মৌলিক অস্তিত্ব বজায় রাখা তখনই সম্ভব। না, কোনও পুরুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয় বা অহেতুক পুরুষকে দোষারোপ করাটাও অনুচিত। এটা মেয়েদেরই করতে হবে, তবে হ্যাঁ, নারী পুরুষ উভয় মিলেই করা যায়। আসলে 'স্বাধীন মেয়ে' হল সেই মেয়ে যে কারও অধীনে নয়। যে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করে, উপরন্তু অন্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে থাকে।

অর্থাৎ যে মানুষ হিসাবে সমস্ত অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকে। বজায় রাখে তার আত্মসম্মানবোধ। আবার বলা যেতে পারে 'স্বাধীনতা' বা 'লিবারেশন' মানে সুযোগের সদ্ব্যবহারও। সুযোগ সব সময় থাকে না সুযোগ করে নিতে হয়। শুধু সুযোগ থাকলেই হবে না সুযোগ অর্জন করতে হবে। স্বাধীন নারী নিজের দায়িত্ব নিজ নিয়ে চলে। কারও উপর নির্ভরশীল নয়। তবে স্বাধীন নারী কখনই পুরুষ বর্জিত জীবনের কথা বলে না। একজন পুরুষের যেন নারীর প্রয়োজন তেমনি একজন নারীরও পুরুষের সান্নিধ্যের প্রয়োজন। তাই স্বাধীন নারী স্বাধীন সত্তায় পুরুষের ছবি আঁকে কিন্তু কখনই তার নিজস্ব সত্তাকে পুরোপুরি বিসর্জন দিতে চায় না।

একটা সময় বলা হত মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষিত না হলে তারা এগোবে না। তাদের আত্মসম্মানবোধ তৈরী হবে না। শুরু হল মেয়েদের শিক্ষা, বাড়তে লাগলো শিক্ষিত মেয়ের সংখ্যা। কিন্তু 'স্বাধীনতা' আনতে শিক্ষার পাশাপাশি আর্থিক স্বাবলম্বী হবার প্রয়োজন অনুভব করে শুরু হল কাজ খোঁজার পালা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য এই প্রবণতা আরও বেড়ে গেল। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে লাগল। আর এই সাথে নারী স্বাধীনতাপন্থী মেয়েদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে বেরোতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরুষরাই তাদের সাহায্য করেছে। কর্মক্ষেত্রে তাদের পুরুষের সাথে তাল মেলাতে হলে প্রয়োজন শারীরিক সক্ষমতা আর এই শারীরিক 'স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন মানসিক স্বাধীনতা যা অর্জনের জন্য বহু মহিলাই এখনও সংগ্রাম করে চলেছে। আমাদের সমাজে অতীত থেকে বর্তমানের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সব ক্ষেত্রেই একটা পরিবর্তন এসেছে ঠিকই কিন্তু সেটা বড়ই ভাসা ভাসা। আজও সমাজের অধিকাংশ পুরুষশাষিত ফলে স্বাধীনচেতা মহিলারা তাদের নতুন মূল্যবোধ জাহির করতে গেলেই পুরুষের বহুযুগের তৈরী সংস্কারের মূলে আঘাত পড়ে। আর বেশিরভাগ পুরুষই সেই আঘাত সহ্য করতে পারে না।

এতদিন নারী নিজেকে তৈরী করেছে পুরুষের যোগ্য করে। পুরুষই তার প্রয়োজন ও স্বার্থের প্ররোচনায় তৈরী করেছে আদর্শ নারীর ভাবমূর্তি। নারী জীবনের সার্থকতা ছিল এই ভাবমূর্তির মতো করে নিজেকে তৈরী করা। কিন্তু কিছুটা হলেও আজকের নারী তার স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। অর্থনৈতিক সাফল্যের সাথে সাথে তার ব্যক্তি স্বাধীনতাও ক্রমশ বিস্তারিত হচ্ছে। জীবনসঙ্গীর জন্য পছন্দসই পুরুষ নির্বাচনের স্বাধীনতা আজ তার এসেছে। এসেছে কর্মজগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বাধীনতা, এসেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু তবু কেন আজও সে অপরাধবোধে ভোগে? কেন আজ সে পুরানো সংস্কারেই আটকে আছে? বাইরে কাজ করার জন্য বেশিরভাগ মেয়ের মধ্যে কেন এক ধরণের অপরাধবোধ কাজ করে? কেন তারা বাড়ি ফিরে দ্বিগুণ শ্রম ব্যয় করে। আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আজও নারী সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নয়। আজও তাকে প্রথমে দেখতে হয় সংসার তারপর কর্মজগৎ। আর এই দুটি দিক ম্যানেজ করতে করতে আজ নারী বড্ড ক্লান্ত।'

সবচেয়ে অবাক লাগে এই সংসারে পেছনে তার সমস্ত শক্তিটা ব্যয় করার পরও 'খুঁটিনাটি আলোচনা' নেবার স্বাধীনতা তার অনেকক্ষেত্রেই থাকে না। তবুও এই সংসারকেই তার নিজের অতি আপন, অতি কাছের বলে ভাবতে হয়, মানতে হয়, আর মানিয়ে নিতে নিতে, সইয়ে নিতে নিতে নারীও ভালবেসে ফেলে তার সাংসারটিকে। পরাধীনতার আশ্রয়টিকে মুখ বুজে ভালবাসতে শেখে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আজও একক নারীর সাফল্য সুখের নয় অনেক ক্ষেত্রে। তবে নারী যতই স্বাধীন মনোভাব সম্পন্ন হোক না কেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আজও তাকে সবকিছু মানিয়ে নিয়ে চলতে হচ্ছে। চলতে হবে যত দিন না লিঙ্গবৈষম্য ঘুঁচবে।

স্বনির্ভর, আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব, উদার মানসিকতা ও অর্জিত ব্যবহার যার রয়েছে তাকেই স্বাধীন বলা হয়।

স্বেচ্ছাচারিতা, উশৃঙ্খল জীবনযাপন করাকে নারী স্বাধীনতা বলে না।

ধর্ম সম্পর্কিত কিছু আলোচনা

সাহেল রানা
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ

ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান নেই এমন লোক খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। ধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকলেও প্রত্যেক মানবের মধ্যে অন্তত ধর্মের নিয়মাবলীগুলিও ঢুকে আছে। এমন কী নাস্তিক সম্প্রদায়গুলিও চরমতম পর্যায়ে ধর্মের স্মরণাপন্ন হয়। এখন, ধর্ম কী? ধর্মের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী?

ধর্ম বলে কোনো জিনিস না থাকলে মানুষের কী ফল হত, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। ধর্ম সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হলেও ধর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে কিছু জানি না। ধর্ম একটি বাংলা শব্দ যা সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হল ধারণ করা বা ধরে রাখা। সুতরাং যা আমাদেরকে ধারণ করে আছে, তাই ধর্ম। ভালোভাবে বুঝতে গেলে বলতে হয়, সামাজিক জীবনে বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে যা মানুষের জীবনকে ধরে রাখে তাই হল ধর্ম। আবার ধর্ম শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল Religion। এই Religion শব্দের অর্থ হল 'বেঁধে রাখা'। বাংলা 'ধর্ম' শব্দ ও ইংরেজি 'Religion' শব্দ দুটির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য থাকলেও উভয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু একই।

পৃথিবীতে যত রকমের সম্প্রদায় বিরাজ করছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। পালনগত পদ্ধতির দিক থেকে ভিন্ন হলেও সব ধর্মের উদ্দেশ্য এক। সব ধর্মই উঁচু স্থানে অবস্থান করে। এই ধর্মের সঙ্গে মানুষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। ধর্ম ও মানুষ যেন পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। ধর্মই মানুষকে খারাপ পথ থেকে ভালোর দিকে টেনে আনে। ধর্মই মানুষের মনে নৈতিক বোধের সৃষ্টি করে। কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর নিজস্ব ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবে রূপায়ণ করে তাহলে সে সমাজে একটা ভালো মানুষ রূপে পরিগনিত হবে; কারণ এমন কোনো ধর্ম নেই যে ধর্ম স্বীকৃতি দিয়েছে অপকর্মকে এবং মানুষকে খারাপের দিকে পতিত করেছে। আমরা হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ যে কোন ধর্মকে দেখিনা কেন সব ধর্মেই মানুষের কল্যাণের কথা বলে।

যদি মানব সমাজে ধর্ম বলে কোনো কিছু না থাকত, তাহলে মানবজাতির মধ্যে খুন, সন্ত্রাস, অপরাধ, ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতি কুকর্মগুলি প্রধান হয়ে উঠত। এই ধর্মই মানুষকে কু-কর্ম থেকে বিরত রেখেছে। ধর্মহীন মানুষ সৎচরিত্রবান হতে পারে না। যদি আমরা দেখি স্বামী বিবেকানন্দকে, স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতীকে, মহাবীরকে, হযরত মহম্মদকে (সাঃ) তাহলে তাদের মধ্যে থেকে একটা গুণ প্রকাশিত হয়, আর তা হল সৎচরিত্র। আর এই ধর্মই সৎচরিত্রের সৃষ্টি করে। আর এই সৎ চরিত্রবান ব্যক্তিই সমাজে ভালো মানুষ রূপে উল্লেখিত হয়। ধর্মের মধ্যেই আমরা মানবতাকে খুঁজে পাই। রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম হল একটাই, আর তা হল মানব ধর্ম।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] পরিশ্রম করে [illegible] এই [illegible] পিছিয়ে নেই। তারাও [illegible] সুযোগ না পেয়ে, [illegible] হারিয়ে বাবুর [illegible] অথবা [illegible] বা [illegible] এভাবেই কত শত প্রতিভা [illegible] অকালে [illegible] দুর্বিষহ। এর আর [illegible] কারণ [illegible] মানুষেরা [illegible] অমূল্য [illegible] পথ সহজ [illegible] এই অসহায় নিরীহ শিশুদেরকে।

আমরা [illegible] সকলেই অনুধাবন করতে পারি, এই শিশুশ্রম সমস্যার নিরসন হওয়া দরকার। কিন্তু তা পরিকল্পিত [illegible] না। এই সমস্যার [illegible] শিথিল [illegible] সমাজের অর্থনৈতিক [illegible]। [illegible] সমাজ ব্যবস্থা কোনদিনই সম্ভব [illegible] দ্বিতীয়ত, সকলের মধ্যে যথার্থ শিক্ষা ও [illegible] জ্বালাতে হবে। তৃতীয়ত, [illegible] নামিয়ে আনতে হবে। [illegible] মালিকপক্ষ [illegible] নিজের সন্তানের প্রতি যে যত্ন [illegible] (১৫) [illegible] যত্ন নেন না, পরিবারের [illegible] পরিচালক, পরিচারিকা শিশুটির প্রতি [illegible] প্রতিটি মানুষের শিশু আইন মেনে চলা উচিত। [illegible] প্রতিটি শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করার ব্যবস্থা [illegible] সরকার [illegible] শিশু শ্রমিকের হার কমাতে পারে। [illegible] প্রশাসনকে আরও বেশি অনুসন্ধান বা [illegible] চালানো উচিত যে, কোথাও গোপনে শিশুকে [illegible] খাটানো হচ্ছে কিনা।

[illegible] শিশুদের অধিকার আইন ঘোষণা

করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, শিশুরা যাতে শৈশবে সবচেয়ে সুখী জীবনযাপন করতে পারে, তার নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর করার প্রয়োজনে তাদের স্বাভাবিক অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হবে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতবর্ষে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শিশু শ্রমিক আইন হয়। নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইনে বলা হয় শিশুদের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে, কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ থাকবে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীতে মোট আনুমানিক আড়াই কোটির বেশি শিশু শ্রমিক বিভিন্ন কাজে কর্মরত। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। আর এই দেশেই অপেক্ষাকৃত বেশি শিশু শ্রমিক বর্তমান। তার কারণ ভারতের ৬০ শতাংশ লোকই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। আর দারিদ্র্যই শিশুশ্রমিক তৈরির অন্যতম কারণ। এরা সকলেই সমাজের দুর্বলতর অংশের দরিদ্র পরিবারের শিশু। এই শিশুরা সারাদিন প্রায় ২০ ঘন্টা বা তারও বেশি কাজ করে একটুখানি থাকা বা খাওয়ার বিনিময়ে। কেবলমাত্র শহরে নয় গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজে, ইটভাটায়, পাথর ভাঙার কাজে শিশু শ্রমিকদেরই প্রাধান্য লক্ষনীয়। কারণ গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিবারে বাবা সন্তানকে শিশু অবস্থায় কাজে পাঠিয়ে তাদের কষ্ট ক'রে আনা অর্জিত পয়সায় নেশাও করে থাকে।

শিশুদের শ্রম মুক্তির মহাকাঙ্ক্ষা। শিশুই হ'ল জাতির ভবিষ্যৎ। আর ভারত সরকার শিশুদের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্পদ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ সেই শিশু কিনা অকালে শ্রমজীবিকার মধ্যে এসে নিজেদের মধুর শৈশবকে চিরতরে হারিয়ে ফেলছে। আর ১লা জুলাই তারিখটিকে শিশুদিবস হিসেবে পালিত হওয়ার আবেদন রেখেছে রাষ্ট্রসংঘ। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন ক'রে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু কেবল স্বাক্ষরেই সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। আমাদের প্রতিটি নাগরিককে সচেতন থাকতে হবে। নিছক কথার কথা বলে নয়, প্রকৃত শিশুশ্রম মুক্তি বাস্তবে ঘটলে শিশুদের ক্রীড়া ও শিক্ষার উৎসবের কলকাকলিতে আমাদের খেলার মাঠ এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ভরে উঠবে।

কলেজের এন.সি.সি. বিভাগ

মহামতি অশোক

আক্তার মোমিন
বি.এ. - পার্ট থ্রি

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যে সমস্ত রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হল মৌর্য বংশ। এই বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক (প্রানুমানিক সিংহাসনারোহন ৩২৪ খ্রিঃ পূর্বাব্দ), তারপর সিংহাসনে আরোহন করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র বিন্দুসার (প্রানুমানিক শাসনকাল ৩০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ)। এরপর সিংহাসনে আরোহন করেন বিন্দুসার পুত্র অশোক (প্রানুমানিক শাসনকাল ২৭৩-২৩২ খ্রিঃ পূর্বাব্দ)। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট।

ভারতবর্ষে প্রথম বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন মৌর্য সম্রাটরা—অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার এবং মহামতি অশোক। তবে সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস এর আগেই শুরু হয়েছে। আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতে বৈদিক যুগের শেষ পর্বে অনেক বড় বড় জনপদ গড়ে ওঠে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অবন্তী, বৎস, কাশী, কোশল, মগধ, কুরু, পাঞ্চাল, লিচ্ছবী প্রভৃতি। এই রকম ছোট বড় মোট ষোলটি রাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলো লিচ্ছবির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করে। পারস্পারিক সংঘাত প্রতিসংঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মগধই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মগধের রাজাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিম্বিসার, অজাতশত্রু এবং মহাপদ্মনন্দ (এরা নন্দ বংশের শাসক)। এই নন্দবংশের শেষ শাসক ধননন্দকে পরাস্ত করে চন্দ্রগুপ্ত 'মৌর্য বংশের' শাসনের সূচনা করেন।

এই সময়েই প্রথমে পারসিক ও পরে গ্রিক আক্রমণ হয় ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে। ম্যাসিডনের সম্রাট আলেকজান্ডার উত্তর পশ্চিম জয় করে তার প্রতিনিধিদের রেখে দেশে ফিরে যান। এবং তার সঙ্গে দুইজন বিবরণীকার ভারতে এসেছিলেন তারা হলেন যথাক্রমে হেফিস্টায়ন ও পার্ডিকাস।

এরপর মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পরপর দুইবার অভিযান করে তিনি উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করেন। এইভাবে তিনি ভারতকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করে তিনি প্রায় সমস্ত ভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মৌর্য সাম্রাজ্যই ছিল সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য।

ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক রাজাও আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাস পরে গ্রিকদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য (৩০৫-৩০৪ খ্রিঃ পূঃ) ভারত আক্রমণ করেন। বিন্দুসারের নেতৃত্বে মৌর্য সেনাবাহিনী এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই যুদ্ধের ফলে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ভারতের বাইরে ব্যাকট্রিয় রাজ্যের কোনো কোনো অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। এরপর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র বিন্দুসার সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিন্দুসার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এছাড়া দুই সম্রাটের মধ্যে মৈত্রী স্বরূপ মোগস্থিনিস 'গ্রিক রাষ্ট্রদূত' হিসাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের পাটলিপুত্রে আসেন। মেঘাস্থিনিস এর লেখা 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থ থেকে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা মৌর্য রাজবংশ সম্পর্কে গুরুত্বপূণ তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্য রচনা করেন 'অর্থশাস্ত্র'। মৌর্য যুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এটিই সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ।

বিন্দুসার সিংহাসনে বসে পিতার (চন্দ্রগুপ্ত) সম্রাজ্যকেই দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। নানা দেশের দার্শনিকেরা তাঁর রাজসভায় আসতেন। তিনি তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন।

সবচেয়ে বড় কথা হল তাঁর রাজসভায় সমস্ত লোকেরাই সমান সমাদর পেতেন।

এই মৌর্য সম্রাট বিন্দুসারের পরই তার পুত্র অশোক সিংহাসনে বসেন। (আনুমানিক শাসনকাল ২৭৩ - ২৩২ খ্রিঃ পূঃ)। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বহুদিক থেকেই ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি একেবারেই গোঁড়ামিমুক্ত ছিলেন। তাতে মনে হয় তাঁর পিতার অনেকখানি প্রভাব ছিল। মৌর্য সম্রাট অশোক পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সমস্ত রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে এই বৌদ্ধধর্মমত প্রচার করার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন। অশোক তার সাম্রাজ্যের অজস্র স্তম্ভ লিপিও শিলালিপিতে সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধে তার চিন্তা ভাবনার কথা লিখে রেখে গেছেন। তিনি প্রায় আটত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

মৌর্য সম্রাট অশোক স্বাধীন কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন (২৬১)। বহু ক্ষয়ক্ষতির পর কলিঙ্গ রাজ্যকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করার পর তিনি ঘোষণা করেন যে আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই অর্থাৎ তিনি যুদ্ধনীতির পরিবর্তে ধর্মনীতি ঘোষণা করেন। অশোকের এই ধর্ম একেবারেই মানব ধর্ম। তিনি রাজা হয়েও ঋষির মতো জীবনযাপন করতেন তাই তিনি বলেছিলেন ' সকল মানুষ আমার সন্তান তুল্য।' 'প্রজার কাছে আমার ঋণ আমি শোধ করব প্রজাকল্যাণ করে'।

তিনি আরও বলেছিলেন যে "অপরের ধর্মকে অশ্রদ্ধা করে নিজের ধর্মকে শ্রদ্ধা করা যায় না"। অশোকের এই চিন্তাগুলো যে কোনো যুগেই অনুসরণ করার মতো।

অন্যান্য মৌর্যরাজাদের মতো অশোকও একজন স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। তবুও তিনি প্রজাকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সর্বস্তরের প্রজাসাধারণ ঐ কল্যাণের সুযোগ সুবিধা পায়নি। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের মধ্যে থেকেও মানুষের কল্যাণের জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন—সে জনাই তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সম্রাট অশোকের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক বিচক্ষণতার জনাই মৌর্য সাম্রাজ্য বিশাল বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক অশোক-এর কলিঙ্গ যুদ্ধের নির্মম হত্যালীলা তাঁকে শোকাবিভূত করেছি... হৃদয়ে অনুশোচনার ভাব জেগে উঠেছিল। পরি... তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, এমনকী রাজনৈতিক জীব... আমূল পরিবর্তন এসেছিল। তিনি প্রজাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ বিধানের জন্য পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সামরিক অভিযানের নীতি পরিত্যাগ করে ধর্ম বিজ... নীতি গ্রহণ করেন যা পরিচিত অশোকের 'ধম্ম' বিজয় নীতি নামে। অর্থাৎ অশোক ধম্ম বলতে বুঝিয়েছে কতকগুলি নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশকে—যেগুলি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখবিধানে ... করে যেমন—পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, গুরুজনে প্রতি ভক্তি ইত্যাদি। মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর এ... বিখ্যাত লিপিতে ঘোষণা করেছিলেন যে "সকল মানু... আমার সন্তান। (সবে মুনিসে প্রজা মম)। নিজ সন্তা... সম্পর্কে আমি যেমন চাই তার হবে সুখ, তেমনই সকল মানুষের জনাই আমার কামা। কেবল শাসন নয়, রাজ্যে কল্যাণ, প্রজাদের মঙ্গল সাধন ও দুঃখ নিবারণ সকল... ধর্মের মর্মবস্তু করে মনতত্ত্ব বিকাশের নিরত আন্দোলনই হল অশোকের ধম্ম। অশোক কখনোই ব্যক্তিগত লাভে... জন্য ধম্ম প্রচারের কথা বলেননি। তিনি ধম্মকে দেখিয়েছে... সামাজিক দায়িত্ববোধের উপরে। সম্রাট অশোক নিজ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেও তিনি কখনোই জোর করে ধর্মপ্রচার করেননি। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হ... অশোকের ধম্ম ছিল কতকগুলি ব্যবহারিক নীতি য... মানুষের তাত্ত্বিক উন্নতি ঘটায়। সমসাময়িক উপাদান থেকে জানা যায় যে তিনি ধম্ম প্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নিযুক্ত করেছিলেন এবং সিংহলে মহেন্দ্রানিতা ও সংঘমিত্রাকে প্রেরণ করেছিলেন। (যদিও এই ধম্ম কথাটির অর্থ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে মতপার্থক্য আছে।)

সে যাই হোক মহামতি অশোক ছিলেন একজন প্রজাকল্যাণকামী, সৎ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আদর্শবান ও প্রতিভাবান এবং পরধর্মসহিষ্ণু শাসক। তিনি কয়েকটি নির্দেশ পালনে... কথা বলেছিলেন সেগুলি হচ্ছে—হিংসাও প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা, আত্মীয় স্বজন, পিতামাতা, ... ক্রীতদাস প্রভৃতির সঙ্গে সুব্যবহার করা, সমালোচনা থেকে দূরে থাকা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ ও অহংকার থেকে

তিনি মানুষকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথাও বলেছিলেন।

অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাটলিপুত্র নগরে (আনুমানিক ২৫১ খ্রিঃ পূঃ) বৌদ্ধদের মধ্যে পারস্পারিক বিবাদ মেটানো ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মোগলিপুত্ত তিসুস বা তিষ্য (মতান্তরে উপগুপ্ত)। সম্রাট অশোকের প্রধানমন্ত্রী তথা সচিব ছিলেন রাধাগুপ্ত।

প্রাচীন সহিত্য উপাদানে যথা 'মহাবংশ' ও 'দীপবংশ' থেকে জানা যায় যে অশোক সিংহাসনারোহনের জন্য নিরানব্বই জন ভাইকে হত্যা করেছিলেন। তাই এই দুই উপাদানে অশোককে চন্ডাশোক বলে অভিহিত করা হয়েছে। (যদিও এনিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে)। অশোক তার লেখাতে নিজেকে দেবনাম প্রিয় প্রিয়দর্শী (নয়ন মনোহর) হিসাবে উল্লিখিত করেছেন। অশোকের গুহালেখে উৎকীর্ণ আছে, বর্তমানে বিহারের গয়া জেলার বারাবার পাহাড়ের তিনটি গুহাতে। এছাড়া ভারততত্ত্ববিদ জেমস প্রিনসেপ ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মী লিপিতে রচিত একটি অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। যা থেকে তাঁর রাজত্বকাল ও কৃতিত্বের কথা জানা যায়।

অশোক সিংহাসনে বসেন ২৭৩ খ্রিঃ পূর্বব্দে এবং তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ২৬৯ খ্রিঃ পূঃ। কলিযুদ্ধের পর (এই যুদ্ধই ছিল তার জীবনের অর্থাৎ অশোকের জীবনের শেষ যুদ্ধ) তিনি যোদ্ধাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হন। তিনি কলিঙ্গ ছাড়া আর কোনো রাজ্য জয় করেননি। তিনি রাজা হয়েও ঋষির মতো জীবনযাপন করতেন। সর্বোপরি অহিংসার বাণী প্রচার করা ছিল তার ধর্মের মূল কথা। তিনি বলেছিলেন পার্থিব জগতে ধর্ম পালন পারলৌকিক সুখের অধ্যায়।

যাই হোক সম্রাট অশোক প্রজাকল্যাণ করে অর্থাৎ প্রজাদের হৃত সুখ কামনা করে কতকগুলি জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আর এই জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর জন্য তিনি ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন।

তাই সম্রাট অশোক দাবি করেছিলেন—"আমি পথের দুধারে বৃক্ষরোপন করেছি যাতে আমার প্রজাবর্গ ও পশুপাখি এবং কীট পতঙ্গ গাছের ফল ও ছায়া ভোগ করতে পারে।" "আমি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছি যাতে আমার প্রজারা এই দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা লাভ করতে পারবে।" "আমি ন্যায় নীতি স্থাপন করেছি....."।

আমি এইসব কাজ করলাম যাতে আমার প্রজারা ধর্মের প্রতি অনুগামী হয়।

মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার জন্য তিনি প্রাচীন ভারতের 'জাতীয় সম্রাট' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি যেমন একাধারে ছিলেন সাহসী, ধৈর্যশীল, সহ্যশীল এবং বিদ্যা ও বিদ্যানের পৃষ্ঠপোষক, শিল্প সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী, অন্যদিকে তেমনই পরধর্ম সহিষ্ণু শাসক। তিনি ছিলেন ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী ও প্রজাবর্গের মঙ্গলাকাঙ্খী। তিনি সদাসর্বদা প্রজাকল্যাণকামী কার্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সর্বোপরি বলা যায় সম্রাট অশোক তাঁর প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য যে স্তম্ভ বা চক্র ব্যবহার করেছিলেন তা পরিচিত অশোক স্তম্ভ বা অশোক চক্র নামে। এই স্তম্ভটি ভারত সরকার উন্নতি ও প্রগতি এবং সত্যের প্রতীক হিসাবে ভারতের সংবিধানে বিধিবদ্ধ করেছেন।

মৌর্য সম্রাট অশোকের অপর দুটি কৃতিত্ব হল—'দন্ড সমতা' ও 'ব্যবহার সমতা'। 'দন্ড সমতার' অর্থ হল—একই অপরাধে সকলে সমান শাস্তি পাবে। আর 'ব্যবহার সমতার' অর্থ হল—আইনের চোখে সকলেই সমান (অর্থাৎ আইনের ক্ষেত্রে ধনী, নির্ধন, অব্রাহ্মণ সকলের বিচার হবে সমান, সামাজিক বা শ্রেণিগত বৈষম্যের টানাপোড়েনের মধ্যে নয়)। এই সব কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সম্রাট অশোক মহামতি অশোকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন ও মৌর্য সাম্রাজ্যের গৌরবকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এজন্যই তিনি ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

Voyages in the Third Theatre and its Changing Language: A Revisionist Study

Suddhasattwa Banerjee

Assistant Professor in English, Hiralal Bhakat College, Nalhati Birbhum

There are voyages on various levels in Sircar's Third Theatre. The most prominent among them is probably from a state of being constantly exploited to a state of holding absolute power and having grasp over the governing mechanism. Unlike the playwrights of the street theatre, Badal Sircar never assumes the role of an agitator. He is rather a propagandist who presents many ideas as an integrated whole providing a complex explanation of the contradictions found in the society. He uses the theatrical space in such a way that the spectators feel that they are part of a maze. It is startling to see the actors moving in the environment created by the spectators between and around. His characters utter brief speeches, so that they can make much use of their bodies and the audience can concentrate on the action. Thus the theatrical language undergoes a thorough change in the plays by Sircar.

And yet, when he was at the peak of his creativity, hailed as a modern master, Badal Sircar quit and went away. He didn't quit writing, and he didn't go away from theatre. He quit being a 'playwright', and abandoned the urban proscenium stage of psychological realism and the box set, a theatre that showcased the actor and pandered to his ego. That sort of theatre often became, in effect, a vehicle for the actor to show off. In Bengal, the urban proscenium theatre was also overtly verbose. When an actor of the calibre of Shombhu Mitra was on stage, no one minded, because it was a pleasure to listen to him deliver Tagore's lines. With his level of virtuosity, one almost felt it was right to show off. It became a drag when lesser actors pretended they had the stuff.[1]

But then, what was the alternative? Sircar couldn't simply have embraced the rural theatre. He was city-bred, and he did not want to be an imposter in the rural theatre. So he created what he called the 'Third Theatre'. This was a theatre that lived and breathed among the common people that spoke of their lives that cried their tears and dreamed their dreams. This was theatre for social change. Later, he preferred the term 'free theatre' to 'Third Theatre'. Not only was this term less confrontationist, it was also more accurate.

Like Brecht, he is a Marxist but not a spokesperson of any established political party. Sircar's protagonists can be taken as prototypes of a particular class in a society at a particular period and his plays are left open-ended so that the spectator assumes the protagonist's role in the revolt and determination. His characters utter brief speeches, so that they can make much use of their bodies and the audience can concentrate on the action. He used minimal props and improvised dialogue to involve audience into the performance. His actors are constantly on the move, walking, running, dancing or jogging.[2] Sircar creates a most bewildering environment with the bodies, backs, faces and profiles of the spectators.

Sircar and his group Satabdi performed their

plays anywhere - in large rooms or halls, in the open, in fields, in parks and gardens. This was 'free' theatre. It required no ticket to see it, and it required very little money to do. More importantly, it was free in the sense of being free of constraints and obligations. It was insolent, unafraid to speak its mind. What this theatre did require, though, was imagination. Too much of what goes in the name of 'street theatre' (particularly today, when the NGOs have appropriated the form to a great extent) is patronising, artistically weak, imaginatively barren and plain boring. Sircar's theatre was never barren, intellectually or aesthetically. You might or might not agree with him, but you could not dismiss his theatre. In plays such as Bashi Khobor (Basi Khabar, 'Stale News', 1978) and Bhoma (1979), Satabdi created some of the finest instances of 'physical theatre' in India.[3]

In other words, in Sircar's work, writing, directing, and acting in plays became seamless parts of the larger process of creating theatre. And while he continued writing plays, the act of creating theatre involved, more and more, the reconfiguration of the performance space, and manipulation of actors' bodies and voices to create meaning. Dialogue within the group became for him as important as dialogue in the play and dialogue with the audience.Initially, Sircar was sceptical about the audience taking to his plays, which were more complex and sophisticated than the average street theatre being performed there. But he was to be surprised. Over time, a serious and regular theatre going audience developed at Surendranath Park.

Ideologically, it is a little hard to characterise Badal Sircar's theatre. He started with light hearted comedies (Ballabhpurer Rupkatha being one of the best known, and is still popular), then went on to express the angst and rootlessness of the urban middle class in his classic plays, and eventually, in his post-proscenium phase, he became more consciously anti-establishment. However, a certain sort of political ambivalence is inscribed into his plays and in fact into his dramaturgy itself - in the sense that the non-verbal can just as easily oflatten' meaning and equalise opposites. His theatre could was, variously, angry, nihilist, hopeful and deeply humanist. He didn't delude himself that he could, in some magical way, transcend his class roots simply by mouthing radical slogans. In talking about his creative journey, he recounts the following:

> "But should we make a play on the Santhal revolt of 1855-56, taking roles of Santhals and the oppressors? The answer was - no. Then what? We shall show it from our point of view, that is, the point of view of a contemporary person belonging to the city-bred, educated middle class community. Why? Because we want to link that revolt to the present-day reality."[4]

Sircar's relations with the organised left remained awkward at best. Utpal Dutt, Sircar's near exact contemporary and member of the CPI (M), hardly ever spoke kindly of Third Theatre. Perhaps because he was familiar with Dutt's style, which was somewhat robust and highly polemical, to the best of my knowledge, Sircar didn't respond to Dutt in kind. Some of his less patient followers did, however, and the mutual suspicion hardened over the years. This was unfortunate, because Sircar made a tremendous contribution by taking quality theatre to non-formal spaces. He was a key figure in what Safdar Hashmi called the 'democratisation of Indian theatre'.[5]

Above all, what Badal Sircar did was to seed practice and train practitioners. This is a part of his legacy that has not been appreciated enough. But through the 1970s, he travelled all

over the country, holding workshops in the techniques he was exploring. The Kannada left-wing theatre group Samudaya (the theatre director Prasanna was associated with it, as was, though not so centrally, Karanth) invited Satabdi for a performance, and followed it up with a two week workshop with Sircar in Kumbulgod. This led directly to Samudaya taking up street theatre in 1978.[6] Samudaya went on to become one of the finest exponents of street theatre in the coming years.

Or take the case of the Manipuri director, H. Kanhailal. Expelled from the National School of Drama because he couldn't manage either the 'high' Hindi expected of him, nor very good English, Kanhailal found his own unique idiom after a workshop with Sircar. It was Sircar who introduced the non-verbal, physical idiom to Manipuri theatre.[7] Sircar had got the psycho-physical exercises of the avant-garde Euro-American theatre from the Polish director and theorist Jerzy Grotowsky.

About a decade before his death, Sircar had an accident, which had severe implications on his physical ability to act in or direct plays. What he achieved, though, was to enter into creative, nurturing collaborative relationships with other theatre groups active in and around Kolkata. Some of these groups folded up fast, but two had a long life - Ayna (founded 1978) and Pathasena (founded 1979). Both these groups considered Sircar their mentor, and he played an active role in training them, and sometimes also directing plays for them. Along with them Satabdi is among the handful of theatre groups continuing down the path of Third Theatre-"with its sociopolitical breadth and dramatic vision, it was the one and only such theatre movement in the country," says art and theatre critic Samik Bandyopadhyay. "Badal babu pioneered a movement that was really needed. He would later call Third Theatre free theatre and it set theatre free in every sense of the term,"[8] adds Bandyopadhyay.

Abiding by the "flexible, portable and inexpensive" tenets of Third Theatre, the group has shunned the proscenium stage, fame and corporate sponsorships to take its theatre to the masses, performing in open fields, villages, slums and at roadside venues, relying entirely on donations.

> "We can carry our theatre in a side-bag whereas for a proscenium theatre to travel, you'll need at least a small truck to carry things around,"[9]

says a member. Sircar, who had already been awarded the prestigious Sangeet Natak Akademi and Padma Shri for landmark proscenium plays like Ebong Indrajit, Bollovpurer Rupkatha, Baaki Itihaash and Pagla Ghoda, imagined theatre outside the restrictive boundaries of the proscenium stage-a format that distanced the audience from the actor through its elevated stage, blinding lights, expensive production values and hierarchical sitting arrangements decided by ticket value with commercial concerns dictating content. And when he renounced the proscenium stage to embark on his first Third Theatre production, Spartacus, in 1972, the group started travelling to its audience, rather than the 'other way round'.

Sacrificing theatrical props, Sircar and Satabdi reached out to new audiences. Initially, Satabdi, founded in 1967, started performing in what Sircar called the angan mancha -spaces like rooms, halls and courtyards. It soon moved on to mukta mancha-open-air, unbounded spaces like parks, streets, slums, fields, at factory gates and in villages. In 1976, Satabdi started giving free performances at central Kolkata's Curzon Park. About the same time, it began its gram parikrama (village visits), travelling to rural areas, performing for those who were often the subjects of Sircar's writing. This move away from the city stage was

participatory in more ways than one. Satabdi members would charge no fee, moving around with a chador (sheet) collecting voluntary contributions from villagers and city audiences.

> "When our theatre became free, the contributions that audiences made were neither donation nor price. That is their participation. Which is why-even when we performed at poverty-stricken places we would go around with the chador. Why should we deny them the chance to participate?"[10]

Sircar explained to theatre personality Adhrish Biswas in an interview, republished earlier this year by the publishing house Guruchandali in a 31-page booklet, Michhilye Badal Sircar-the interview had initially appeared in the Amritalok magazine in 1996.

In the same interview, Sircar says Bandyopadhyay was his only supporter when he faced criticism from the proscenium theatre society in Kolkata-an entire issue of a popular theatre bulletin was devoted to criticizing Sircar's Third Theatre.

> "In the early 1970s, the signs were clear that India was moving towards the Emergency. A radical, political theatre had to function and proscenium, which was dependent on money and capital, lacked an independent political voice. Sircar started this theatre which was not dependent on economics,"[11]

says Bandyopadhyay. Even when Sudeb Sinha shot a documentary film on Sircar, A Face In The Procession, which was completed in 2013, he found very few personalities from Kolkata's vibrant proscenium theatre circuit willing to talk about Sircar; symptomatic of the systemic neglect that Sircar's Third Theatre work has faced in Bengal.

This was very different from the eulogies that flowed generously from doyens of the theatre world in other parts. Appreciation from the likes of Girish Karnad, Amol Palekar, Sudhir Mishra, Naseeruddin Shah, Mira Nair, Mohan Agashe, Shreeram Lagoo, Rohini Hattangadi, Amrish Puri, Satyadev Dubey and Makarand Sathe is indicative of the extent of Sircar's influence. Karnad notes that Ebong Indrajit taught him fluidity between scenes. Dubey went to the extent of claiming that

> "in every play I've written and in every situation created, Indrajit dominates",

while Mishra says Sircar provokes and dismantles his beliefs.

> "I'm unable to compromise because Badal babu sits inside my head."[12]

he adds.

Through his writings and public statements, Sircar was often critical of proscenium theatre.

> "Back then, proscenium theatre in Bengal was upholding a left, radical position in terms of ideology. They were not prepared to take any criticism. They would contend that the exposure that Badal babu got to American playwrights like Richard Schechner and Judith Malina made Third Theatre a derivative form and one that was importing a culture considered as obscene and reactionary in Bengal,"[13]

says Bandyopadhyay. In the rejection of proscenium—what he would define as second theatre. India's indigenous folk theatre being the first—Sircar was also throwing out the Victorian influences of the proscenium stage while establishing a form that spoke up against militarism, state-sponsored violence, exploitation, tenure of the common man and the marginalized, using Indian motifs.

In Voyages in the Theatre —a book encapsulating Sircar's 1992 Shri Ram Memorial Lectures in New Delhi—the actor-director talks about his lesser-known, interactive play Muktamela.]n it, spectators are allowed into the venue, a Kolkata house, only to be asked provocative and insulting questions by Satabdi members on their income and marital life. They are frisked and ordered around before being let into a terrace room where the play portrays different situations, from abject greed to ear-splitting screams from the tortured.

> "We of the middle classes like to believe that we are free, but in reality we ,have to suffer the indignities of bondage and restrictions quite often. Our idea was to put the spectators in a situation which would remind them of those indignities through a direct theatrical experience,"[14]

Sircar explained. The formulation of a Third Theatre grew out of Sircar's dissatisfaction with Conditions of the proscenium stage. Conventional proscenium theatre's over-dependence on expensive paraphernalia which has no relevance in the theatre was one of the reasons for Sircar's disillusionment with the format. According to him sets, props and costumes are used to create illusion of reality, but spectators have come to theatre ready to use their imagination and they are prepared to accept the stage as a stage. This condition of the proscenium theatre hits the direct communication between the performer and spectator. As theatre is a live-show, as in theatre live person communicates directly to another live person; this is the fundamental characteristic of the theatre which makes theatre differ from other art forms. Secondly bright lighting that blanks out audiences where audience-actor interaction is impossible because it separates performers and audience. Thirdly the sitting arrangement made in proscenium theatre i.e. raised stages, stage-facing sitting arranged according to ticket prices these were other issues he had problems with.

Satabdi first moved off the elevated platform to perform in rooms. This was alternately called "intimate theatre" or 'Anganmanch' (an angan being an indoor courtyard, a decidedly intimate space in community life). In 1972 Satabdi performed Spartacus, its first 'Anganmanch' piece, presented in a room at Kolkata's Academy of Fine Arts, itself an established venue of conventional theatre. This was his first major experiment in the direction of Third Theatre. The other plays specially written for Third theatre are Michhil (Procession), Bhoma, and Basi Khabar (Stale News). Michhil, performed in 1974, two years after Spartacus, in Ramchandrapur, a village in West Bengal, was the first play designed entirely forthe open air. Sircar then did an experimental production of Gour Kishore Ghosh's Sagina Mahato which Satabdi had earlier enacted within the proscenium format when he realized the need to leave the proscenium theatre. Sircar evinces:

> "With normal room-lights, we performed not by merely facing our audience, but also on1 their sides and sometimes switching to the background, aptly, sharing space with them. Nearly everyone, who had previously seen Sagina, agreed that the play was far more effective in the reoriented scheme."[15]

By the early '70s Satabdi's proscenium productions were unsustainable financially as well as artistically-the group could not afford to rent a theatre to show their work. Unwilling to give in to the stasis, Sircar started questioning the very concept of theatre. Interestingly many others at the time, in both Bengal and elsewhere, were experiencing similar

dissatisfactions with the proscenium stage. But Sircar's search of space brought him different answers. He realized that while cinema was a popular medium and could show much more than theatre, it lacked one fundamental element that was inherent to the theatre-liveness. He explains,

"Communication is essential in every art form; the artist communicates to other people through literature, music, painting, acting. But the methods of communication are different. A writer writes-he does not have to be present when his writing is being read. So it is with the painter and the sculptor. In cinema, the film artists do not have to be present when the film is being projected. But in the theatre, the performers have to be present when the communication takes place. This is a fundamental difference. Theatre is a live show, cinema is not. In theatre, communication is direct; in cinema it is through images"[16]

Sircar and his group realized that if liveness was definitive, then the proscenium arrangement was entirely unsatisfactory. Instead of enhancing performer spectator interactions by removing barriers, the proscenium theatre only impeded it by creating obstacles through artificial set-ups of lighting and seating. Rather than pretend the audience did not exist, Sircar saw a need to inhere the audience in the performance. The spectator demands in the new theatre not an illusion of reality, but the reality itself, the reality of the presence of the performer. This meant that the actor and spectator had to share the same space and acknowledge each other's presence. Direct communication was to become the cardinal feature of the Third Theatre.

"Theatre can show very little, but whatever it can show is here, now. The Performers and the spectators come to the same place, on the same day, at the same time; otherwise the event of theatre will not happen.[...] That is the strength. That should be emphasized."[17]

This new theatre depended entirely on acting-the performer's body on the one hand, and the spectator's imagination on the other. As only human presence was to be emphasized, the other paraphernalia of the theatre became superfluous. Elaborate sets were no longer possible; lighting was general and/or minimal. Costumes could be incorporated to some extent but more for symbolic signification. Makeup was now superfluous since the actor and spectator were in such close proximity. These changes did not come to Satabdi all at once. They were wrought gradually through a policy of trial and error:

"We realized that if we do theatre we are doing away with all the costly and heavy items of theatre. [...] So gradually a flexible, portable, and inexpensive theatre is being created. Flexible, and portable, therefore inexpensive. Flexible means we can do it in any condition. Portable--we can carry our theatre easily to places where we want to perform. We don't have to charge any money for that you see. Voluntary donations we will do. So the basis of free theatre is laid."[18]

Third Theatre had turned into "free theatre" in three ways: First, there was free expression it promoted direct and therefore uninhibited communication; second, it was free from the paraphernalia of conventional theatre; and last, it was offered at no cost to the audience. A logical development leading to truly free theatre was the gram 'parikrama'. A true theatre of the people therefore would have to go where

the majority of the population lived. Satabdi went on its first parikrama in 1986 for three days and two nights. It has since been trying to undertake at least two such tours every year. Free theatre is also often loosely used synonymously with street theatre because both are flexible, portable, and inexpensive. And while he has no objections to the conflation per se. Sircar clarifies the distinction. He and other members of Satabdi define street theatre as a quickly created short performance, which has some topical value. So:

> "Street theatre in a way is Third Theatre. But all Third Theatre is not street theatre".[19]

Sircar's innovations in the use of public space have had a profound impact on Indian theatre. Even though experimentation for its own sake was never his intention, his example encouraged many others to explore different styles. But if this purposeful theatre was to survive, it required more than just meddlers interested in its form. What was needed to carry Third Theatre forward was a group of committed practitioners who were invested in its content. After the scripts for change were written, a movement ensued.

> "The entire process of change involves a philosophy, and [I] believe that the new language can only be established if it takes the shape of a movement"[20]

Third theatre is the fusion of two theatres rural and the urban theatre. In the exploration Sircar had seen the inherent features of folk theatre i.e. live performer and direct communication technique. And the emphasis on the performers body rather than the set-ups and mechanical devices from the proscenium theatre. Thus Sircar combined these features of the rural and the urban theatre and made the third theatre as the synthesis of these two theatres.

In exploration of the theatre Sircar came to realize that the theatre is a human act. Experience is the key word in every art and theatre is also a, kind of art, where people come to have experience. According to Badal Sircar theatre should be a collective exercise to awaken and enhance the social consciousness of participants, including the viewers. So he preferred doing theatre in the open air where audience can participate. Sircar has said of his own theatre:

> "There is no separate stage-the performance is on the floor; that is the Performers and the spectators are within the same environment. [...] This is intimate theatre. The performers can see the spectator clearly, Can approach him individually, can whisper in his ears, can even touch him if he wants."[21]

Third theatre is portable, because it can be moved anywhere. As it does not require heavy set-up, spotlight, furniture, costumes etc. so it becomes portable. Third theatre is flexible because plays can be performed anywhere, it does not require stage. A theatre which can go to where the people are - without waiting for them to come to a specified place. Since it reduced the cost of theatre, and it can be offered at freely, so it is inexpensive. Sircar believed in human relationship not in the buyer and seller relationship. He believed that theatre is a human act; it is art not the source of earning money.

In the Third theatre set -ups are made of collective human act. Emphasis is totally given on the human body. For the free flow of action games exercises are taken in the workshops. Instead of imitating certain stage voices and movements, the performers are taught to giving more from within, replacing the fake in theatre by a true expression of the self. Freeing them from the constraints of realistic depiction, Sircar

encouraged the performers to use movements, rhythm, mime, formations, and contortions to express them physically. Sudhanva Deshpande aptly assesses Sircar's contribution to changing the anatomy of the Indian actor:

> "He more than anyone else pioneered the play without the text. It was the technique of using the actor as text. The body of the actor becomes the text."[22]

The result is a Spartan production which is an ideological position. The stand of course is that "I will use nothing else because that is the essential thing."

Third theatre exhibits an openness and receptivity. Sircar was influenced both Indian folk theatre and western experimental theatre. Sircar adopted direct communication technique and live performance from the Indian folk theatre. Open performance and emphasis on the performer's body from the western theatre. Thus he combined these features and made the Third theatre. Sircar himself admits that he learned the most from observing and sometimes working with practitioners like Jerzy Grotowski, Joan Macintosh, Judith Malina, Julian Beck, and Richard Schechner. But mere observing is other thing; he has not imitated them. Third or free theatre can never be like Grotowski's physical theatre because, Sircar says, those conditions of performance are simply not available in India.

Sircar focused on doing theatre than writing plays, because he had profound knowledge of Indian society where physical, psychological, cultural, mental, political, and spiritual dichotomies reclined. To bring about a change Sircar used theatre as a tool. He was conscious that the dichotomy in the cultural field cannot be removed without a fundamental change in the socio-economic situation, and he knew that it cannot be done through theatre. Though he knew that theatre by itself can never change the society, he firmly believes that theatre can be one of the many facets of a movement that is needed to bring about the desirable change, and that makes the idea of Third Theatre, a theatre to bring about meaningful change.

কলেজের এন.সি.সি. বিভাগ

Groundwater Arsenic Contamination and its Health Impact in West Bengal

Kritiman Biswas
Assistant Professor
Hiralal Bhakat College, Nalhati. Birbhum

Historical Background:

Arsenic is a toxic heavy metal and carcinogenic. Arsenic crisis in India dates back as early as 1976 when a preliminary survey on it in dug Wels, hand pumps and spring water from Chandigarh and different villages of Punjab , Patiala , Haryana and Himaehal Pradesh in northern India was reported by Dr.D.V.Datta.

Officially, Arsenic poisoning in W.B. was first diagnosed by a dermatologist Dr. K.C.Saha of School of Tropical Medicine at Kolkata to an outdoor patient of village Ramnagar of Baruipur police station in the district of South 24th Parganas on 6!h July 1983.Later it came out that many Arsenic affect people/patients existed in many villages well before 1983; but they could not be clinically diagnosed, so were not high lighted. Garai et a! reported the first scientific paper published on Arsenic toxicity in W.B. where he had warned of malignancy of the hyperkeratotic spots and liver if diagnosis is delayed. Then,the School of Environmental Studies, JU,Kolkata joined the Arsenic work at the beginning of 1988.

Geological Characteristics of W.B.:

The state W.B. can be divided into four physiographic zone : i. Districts of Darjeeling, Jalpaiguri, Coochbehar and Alipore Duar in the Himalayan region.ii.District of Purulia and western part of the district of Burdwan, Medinipur.Birbhum and nothen part of Bankura occupy the eastern fringe of Chotonagpur plateau.iii. Sundar ban area of the South 24!h Parganas and a small part of north 24 Parganas form the deltaic zone. iv.Remaining areas of the state being plains.

150 metre to 250 metre thick granular zone occurring as alluvial fans in the extreme northern part of W.B acts as the recharge zone for the unconfined aquifers with high permeability. This zone receives on an average 3000 mm of rainfall annually.This granular zone gets separated in most of the areas by 2 metre to 10 metre thick clay layers within a depth of about 300 metre where confined ground water occurs. These aquifers at depth to the South of the fan zone are hydraulically connected to the recharge zone and contained ground water mildly affected by Arsenic.The recent flood plain deposits of Malda districts , however , recorded high concentration of ground water Arsenic.The" sub surface geological picture of the Southern part of W.B. to the East Achaeans Shield area is nearly similar to it's Northern counterpart except the absence of cobbles and pebbles in the sequence and the pleistocene sedements covering almost one half of the area to the East of the shield areas.

Eastward Holocene deltaic sedements that by nature are characterised by the frequent change from sand to clay and vice-versa at short distances both horizontally and vertically follow it.At the delta head located Murshidabad and Nadia districts, 150 metre to 250 metre thick granular zone containing ground water with high concentration of Arsenic under unconfined condition occurs.It forms the rechargbe zone for the deeper aquifers down South. Like the Northern part, here also this thick granular zone gets separated by several clay layers, the thickness of which gradually increases South ward. Beside, a clay layer appears at the top of the sequence with thickness gradually increasing southward from 2metre to 30metre and direct rainfall recharge to the aquifer below the top clay. These aquifers constitute the confind aquifer system receiving water from the recharge area to the North as well as to the West formed by the weathered sections within the crystalline rocks in the shield area.

In an around Kolkata beside the top clay layer, another 20 metre to 30 metre thick clay Livers occurs at around 150 metre depth , the thickness of which increases from 50 metre 60 metre further South. It is followed by alternating sequence of sand and clay layers down to a depth of about 300 metre. In the delta and flood plain due to attenuation of intervening clay layers, the group of aquifers at depth gewts inter connected at some places giving avenues for polluted /contaminated ground water to travel at deepewr depth.

Arsenic contamination situation in W.B.

Arsenic contamination situation of all districts of W.B. has based on the Arsenic contamination concentration found in the all districts of W.B., we have classified them in to three categories:!. Severely affected,ii. Mildly affected and iii. Arsenic safe

i. Nine(09) districts (Malda, Murshidabad, Nadia, North 24th Parganas, South 24th Parganas Burdwan, Howrah, Hoogly and Kolkata), where more than 300 microgram/litre Arsenic concentration were found in tube wells are categorized as severely affected.

ii. Six (06) districts (Cooch behar, Alipurduar, Jalpaiguri, Darjeeling, North and South Diuajpur), where the contaminated tubewells show arsenic concentrations mostly below 50 micro gram / litre, termed as mildly affected.

iii. The rest five (05) districts (Bankura Birbhum, Purulia, Medinipur east and West). where all the recorded concentrations were below ten micro gram / litre teramed as unaffected or arsenic safe areas.

Sources of arsenic in W.B.

The sediments derived from the metamorphic rocks around Rajmahal hills and other parts of Bihar plateau brought into W.B. by the Ganga and its tributaries. The school of Environmental Studies (JU, Kolkata) analysed borehole sediments from the affected areas and found several sediment layers reach in arsenic.

The arsenic in Pyrite is one important abundant source. Aquifers generally in the depth range 50 feet to 170 feet below ground surface have been found to yield arsenic.

Health Impact in W.B.

The arsenic contents of hair samples of affected persons of Malda, Murshidabad, Nadia,

24th Parganas North and South and Kolkata areas, was found to be from 1.84 to 31.05 mg/kg (Normal values 0.08 to 0.25 rag/kg), nail samples 1.47 to 52.03 mg/kg but normal values Q.43 to 1.08 ppm and urine samples 0.05 to 2.0 micro gram /ml but normal range 5 to 40 micro gram /day. Seven districts where arsenic patients were found clinically about 9356 (9.7%) patients have been registered and out of them 778 (5.6%) patients are children.

When people drink arsenic contaminated water, it begins to kill slowly but painfully, can take eight years to fourteen years to be manifested in person. The few diseases are common in affected areas persons who regularly drink arsenic contaminated water and use it for cooking as below:

i. Melanesia: spotted pigmentations on skin leading to cancer ii. Keratosis iii. Anaemia iv. Dry cough v. Stomach pain vi. Diarrhoea vii. Liver enlargement viii. Haemolysis /destructions of red blood cells.

References:

i. Santra, S.C. Environmental Science, New central book agency Private Ltd., Kolkata

ii. DE, A.K. Environmental Chemistry, New age International Publishers.

iii. http://www.soesju.org/ arsenic/wbShtm.

iv. Ground water arsenic contamination wb, reported work done by soess Kolkata, wb

কলেজের এন.সি.সি. বিভাগ

RELEVANCE OF PANCHSHEEL FOR SINO-INDIA RELATIONS

Biman Saha
Assistant Professor in Po. Science, H. B. College

Panchsheel, a set of five principles conceived in great measure by former Prime Minister of India Jawaharlal Nehru, was the basis of the Agreement on trade and intercourse between the Tibet region of China and India signed on 29 April, 1954. However, after Sino-Indian war in 1962 Nehru and his Panchsheel had to face harsh criticism. Later on in course of time a number of contentions issues like China threat theory, string of pearls, border disputes, trade deficit etc come to the fore front. Thus, it is seemed that Panchsheel is no longer in existence in shaping India-China bilateral relations. The preamble of the aforementioned five-point agreement, popularly known as Panchsheel Agreement signed in 1954 between New Delhi and Peking laid down five principles. These were-1. Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty;2. Mutual non-aggression.3. Mutual non-interference in each other's internal affairs;4. Equality and mutual benefit;5, Peaceful co-existence. Despite such bilateral ties or agreements or strategic dialogues or a series of visits to each other's state, many contentious issues are still alive to make such relations more complex. Therefore, such issues have much potentiality to raise a question - Whether Panchsheel is outdated or relevant in today's scenario?

It is ridiculous to see that India left no stone unturned to keep the dragon happy, though India should have taken a clear cut policy to combat China for keeping peace and tranquility in Asia. From that stand point, many are of the opinion that Panchsheel is not fit for today's Indo -China relations.

Recently, the standoff between Indian and Chinese troops near the India-China-Bhutan tri-junction started on 7th of June, 2017 and still continuing is the longest in three decades and such military standoff leads to diplomatic standoff also. Unlike past instances, this is the first time Indian troops have crossed into foreign territory-the plateau belongs to Bhutan, according to New Delhi and Thimpu to stop Chinese road building. China has accused Indian troops of entering what it claims is its territory-Donglang-while Bhutan has insisted the reign is disputed between Beijing and Thimpu, and India has argued its troops had intervened at Bhutan's request. Such mudslinging between the two nations put a question on the existence of 'Panchsheel Treaty'. India and China accuse each other of trampling on the 1954'Panchsheel Treaty'.

Second, actually, critics do not find any relevance of Panchsheel after 1962 war between India and China, as all the principles of Panchsheel had been violated by China at that time. Indian forces were unprepared and China availed of such unpreparedness so that it could establish its dominance on the disputed land. No doubt, it was China's betrayal of India's offer of friendship. With such attitude China

proved that Panchsheel agreement was nothing but a lip service.

Third, China's 'string of Pearls' policy is a matter of concern for India's security in the Indian ocean, though it is an American hypothesis about China's containment of India. But it is no longer a hypothesis, to the contrary, it is the fact that China extends its strategic hands to establish harbour in Chittagong, Bangladesh in Sittwe, Myanmar in Gwadar, Pakistan, in Hambantota, Sri Lanka etc in such a way, so that, it can dominate Indian Ocean region and becomes able to supress India under constant surveillance. It's so called 'String of Pearls' strategy is a three-pronged approach to check US naval power in the Indian ocean and to ' achieve strategic maritime advantage over India. So String of Pearls is based on the negation of Panchsheel.

Forth, "why China fished in troubled waters whenever India faced bilateral tensions with its neighbours?"-S.D.Muni's question to the panel of the conference held on the occasion of '60th Anniversary of Panchsheel Relevance for India'- is very significant and relevant in in terms of the relevance of Panchsheel. China is always in search of a situation when will the relation between India and any of its neighbours is in trouble. Most of the time when China decides to gives a lesson to India, it plays Pakistan card and set Pakistan against India, as if, Pakistan is a balancer to India. From such point of view China provides arms and other related facilities to Pakistan. This is not only true to India-Pakistan relations, but also to India-Nepal, India-Sri Lanka, India-Bangladesh, India-Bhutan relations etc. For China, the development of relations with Bangladesh was important to keep Bangladesh away from the Indo-Soviet orbit.

Fifth, in the aftermath of the infiltration of Chinese military into Doulat Beg Oldy Sector of India, it is discernible that Chinese aggression is being increased with every passing day. In April 2013, Chinese military force consists of 50 soldiers and dogs violating Line of Actual Control (LOC) and infiltrating into India stayed at the aforementioned Oldy sector. Immediate after consecutive five meetings were held, but no solutions come out. Later on 5th of May, 2013 Chinese military force left India with a relevant question -whether India should follow up Panchsheel?

Sixth, huge trade deficit is another irritant between India and China. Since, 2006 India has been facing such problem very much. The trade deficit of India for the year of 2010 stood at more than20 billion US dollar. Most of China's exports are value-added manufactured goods. On the other hand, most of India's exports are bulk commodities like iron ore. India complains that China gains unfair advantage from an undervalued currency and from protectionism that affects India's high- end exports. India has an objection about dumping cheaper Chinese goods into Indian market. Not much more power of intellect, but common sense is enough to conceive how such trade imbalance forms the flame of India's discontent.

Seventh, China's initiatives to create a dam on Brahmaputra River are showing its aggressiveness which is not consistent with the principles of Panchsheel. New Delhi is very much concerned about the ecological impact on India of Chinese initiative to divert the rivers of Tibet for irrigation purpose in China. For China's evil tendency to control the Tibetan plateau, the source of Asia's major rivers, a possibility of skirmish on scarce water resources

is grown up. Aforementioned initiatives of China are not at variance with the principles of Panchsheel.

Eight, to achieve advantage over India, China uses every possible card that it has. Issuing stapled visa to Indian citizens from Arunachal Pradesh is one of such cards. The fact is that China issued stapled visa on entry to Arunachal officials visiting china. Actually, critics are of the opinion that China's intention is to provocate India. In such a way China always express its lack of interest in obeying Panchsheel Agreement.

Ninth, with these aforementioned burning issues, border tensions still remain as it was in 1950'.India claims Aksai Chin and Trans-Karakoram Tract, as part of Jammu and Kashmir. On the other hand, China claims most of Arunachal Pradesh, a contested disputed territory of northeast India by not recognizing the Mc Mohan Line. Carrying on such irritant how both the countries execute the five principles of properly- now this is a matter of debate and discussion.

Tenth, on the 5th of January, 2000 the 14-year old Ugyen Trinley Dorji, the 17th Gyla kormapa fled to India. His arrival in India, according to China, was India's conspiracy against China. China cautioned India from giving political asylum to the Karmapa. Chinese spokesmen have implied that India giving asylum to Karmapa would be a contradiction of the principles of peaceful coexistence and that it can affect Sino-India relations negatively.

Besides, the proposed Indo-US civil nuclear cooperation, the joint naval exercises by the US, India, Japan, Australia and Singapore in the Bay of Bengal raised further concern in Beijing. Obviously, China fears of such exercises.

Thus, it is quite transparent that Sino- India bilateral relations are a cocktail of mistrust and conflict where five principles of Panchsheel are remained like five orphans. 'You can change friends but cannot change neighbours'- Point of view like that leads us to ponder over the principles Panchsheel in the context of Sino-India relations at the globalised world order and to critically evaluate the points on irrelevance of Panchsheel mentioned in the in the previous section.

Today, we are living in a very different world from that of six decades ago, but the five principles of peaceful coexistence are still relevant. We should continue to uphold, at the same time to further, enrich and develop these principles. Actually, a dream of peaceful world, a quintessence of Panchsheel is not tied to time, space or person, because it has been existed as a prevalent dream among the people of the world since the very inception of human civilization.

CONCEPT OF SUCCESS : WHAT WE HAVE AND WHAT WE SHOULD HAVE

Sudipta Singha
Assistant Professor in English

"Ora baro hobe chorbe gadi
Ar ami Kaatbo ghaash..."

Is there anyone among us who got grown up without hearing these words? I think no one such Right? Almost all of us are very familiar with such sentences which are not only sung as the refrain of Anupam Roy's song 'Classroom', but also heard to get uttered at the moment we get scolded by our parents over being caught neglecting our study. Getting scolded by our parents for neglecting study and over getting bad grades is nothing new to us. To our parents nothing should be given more importance than study. None of our parents tries to take the least care of whether we have any aptitude for other activities than academics. Though they've found any, they don't dare to give a second thought on it. Because, they believe that success in life is a matter of getting a good job with a sound amount of salary which, on the other hand, could only be secured through good grades in this market of competition. In fact every parents wants their child to stand in life. Therefore they get upset when they notice our negligence towards study. On the other hand, instructed thus we participate in the rat race and begin to compete against others, reppressing our talents under the heavy weight of books. Started in such a way, my present topic presents a brief discussion on what the concept of success we have and what we should have.

Achieving success is a kind of desire which every living creature does posses. A lion, chasing a deer out of hunger, finds its success in making the deer its prey and the deer that tries to run fast to aviod being preyed by the lion, finds its success on being able to save its life. So do we, the humanbeing, we got born with an instinct of obtaining a distinct place of our own in this world, a unique position for which we will ever be applauded by others. Therefore, from the very beginning of a child's life, the intelligent parents start sorting out the specific areas which interest most their child. It they find their child has an aptitude for playing cricket or for singing or for dancing or for swimming than for academics and he/she does best on one of those areas, they decide at once to give emphasis on those specific areas of their child's interest. So that their talents can have a little exposure.

Very few of us, however, get nurtured thus and the few who get neared in such a

way become successful in life. The majority of us is, however, made to get used to be with the concept of success that teaches us to take life as a race where we must run as fast as possible to avoid being wicked out of it by others. In fact the environment, the socio-economic background we belong to has been forcing us to think so. We, therefore, find ourselves chasing after success, always keeping an eye on the race, checking whether we are doing betten than others. A kind of fear often haunts our mind and the level of our competition gets increased day by day lest we should lag behind. This is how success has been conceptualised to us and we pass this concept of success into every generation to come. At last the result, we get, is failure, an epic failure.

Whatever socio-economic background we belong to, our concept of success shouldn't be changed because it is not associated with where we live or how we live rather it is related to what we do. In fact doing is what gets on our deeds. Therefore, I have opted the ever applauded Bollywood movie **3 Idiots** (2009), adapted from a Chetan Bhagat's novel. **Five Point Someone,** as a reference to give my discussion a sound support.

The story of the movie seems to criticize the conventional scenario of the education system of schools and colleges, the way the teachers persuade their students to memorize bookish definition to gain good grades in exams and the way the parents pressurise unknowingly their child by imposing their own desires on the way of his/her achievement. The movie, however, inwhole seems endeavoring to deliver indirectly the message of the Gita : "Perform your duty for duty's sake and not for the sake of the reward" through the portrayal of the character of Rancho (Phunshukh Wangdu), a role played by Amir Khan, who, as the movie shows, took admission to the Imperial College of Engineering because Engineering is what he has passion for. Yet, among other students Raju, Farhan and Chatur, who too took admission there, came here only to get the degree with good grades so that at the end of the course they will have a job on their hand at the best companies of the world with a sound amount of salary. Therefore the obtaining of a job at the best companies depends on the rank they will achieve through the exams held at the end of each semester. Thus, confining their areas of learning within the walls of exams, they began to complete with each other through cramming bookish informations as if they are ruming aracs. Rancho, however, was an exception who, unlike his friends, came here only to learn. to learn something new and to enrich his mind with new knowledges. His concentration was neither on the good result nor on the success through obtaining a job. Rather he concentrated more on himself or perhaps on the fact whether he could use his knowledge of present learning to reform what he had learned earlier. His theory of learning never persuaded him to complete with others. What he competed with was the fact whether he could learn more than what he learnt yesterday. This theory of elarning, as the movie shows, would later make success, itself, kneel down at his feet. Therefore, when the result of their first semester came out it showed Ranch to have

appeared to be first in position. Chatur, who strived for the first position, appeared second. Farhan and Raju secured the last and second last position respectively.

The result though made frustrated everyone, expect Rancho for whom results matters nothing, offers a place for present discussion. Let's start with Farhan who became the victim of his parents' desire. As a student he had been bright and performed well in academics. Yet, he had an aptitude for photography. Wildlife photographer was what he dreamt of to be. This dream of Farhan was getting suppressed under his reluctant attempt on fulfilling his parents' desire of achieving success through engineering. This is, therefore, proved fatal to his career as success could be achieved through the works we have passion for. Raju, on the other hand, though wanted to achieve success through what he had passion for, he too is seen to get failed to achieve success. This happens because he fears too much. Tensions of exams, projects predominated his mind and what his mind concerned most were the tension of his family problems which prevented him to give concentration on study. Next comes Chatur who becomes the victim of his own cleverness. He is the one who presents the antithesis of the concept of success presented through the character of Rancho. He believed that the best grades in exams could only be grained through memorising bookish definitions and diverting the mind of his class-mates from giving concentration on study at the time of exams. Success, to him, is to obtain a job with sound amount of salary which will provide him with all material happiness.

The concept of success, what we should have, is, in fact, presented through Rancho whose pranks and tricks shown throughout the movie make his friends as well as the audience spellbound. What everyone memorise to write down on the exam papers, he applies in practical. The purpose of his learning is only to acquire a through knowledge on what he is learning. He tells, "there is lot of knowledge flowing acound us. Don't miss it; grab it from wherever you get it". And, what, he seems to believe, energises him to learn more is his association of lve with what he is learning. This association of love with learning happens only when we learn comething for which we have passion.

Finally I suppose to have been able to come where I am going to draw a conclusion of this discussion again quoting one of the famous dialogues of the movei–"Kamyabi ke pichhe mat bhaag, kabil ban, kamiqabi jhak marke tera pichhe aayegi". That means more we run after success, the faster it escapes from us. Therefore, what we should do is to stop chasing it and to be capable. Success, then, itself will come running after us.

A BRIEF STUDY OF MOTHERHOOD

Amrita Biswas

Assistant Professor in History, H. B. Collge

Motherhood has been endlessly allegorized in the reigning discourses of colonial India. The symbolism of the mother, long -suffering, benevolent and chaste has always been so deeply embedded in mainstream culture, that it makes it impossible to have an all-encompassing view of 'motherhood' without taking into account the various cultural ideals and representations that dominate it. 'Motherhood' as an ideology has been effectively appropriated in various ways by religion and politics alike - be it the recurrent imagery of the Mother Goddess in Hinduism, or in the symbolization of nation where the maternalizedfemale body becomes the site of the emerging nation.

But when motherhood descended on the hard ground of reality, stripped of ail its symbolisms and metaphorical leanings, it painted a rather grim picture indeed. The metaphorical mother- disembodied and spiritual was intensely revered, but her real counterpart was an extremely marginalized subject in national consciousness. The physical body of the mother and the biological process of motherhood were taboos that rarely made it to public sphere. Despite all efforts towards medicalization of childbirth during 19th and first half of the 20th century, majority of population clung to primitive childbearing customs, thoroughly self-destructive and unscientific. Far removed from the alter of the symbolic 'holy-mother', the real mothers gave birth in a squalid room without even the basic necessities of life. It was in the dark and damp confines of the ill-lit and filthy aturghar, that 'real-motherhood' of colonial Bengal played itself time and again.

The maternal population of 19th century Bengal suffered from various problems. The root of these problems lay in the social customs and traditions of the period that tended'to boost the patriarchal setup b\ refusing to see females as anything other than 'vessels'. Girls attained sexual maturity at a remarkably early a ire. Due to the custom of child-marriane. the aae of first time mothers was extremelv low. The term 'child-marriage' is in fact a misnomer as children were not supposed to be married. It is of little surprise that these child brides became under aged mothers with tragic results. Various experts including renowned physicians and social thinkers of the period believed that there was an inviolable link between child-marriage and early sexual maturation of girls. They also linked the phenomenon of child marriage with the high rate of maternal mortality in colonial Bengal. Kailasbasini Devi in her famous book 'Hindu Mahilaganer Hinabastha' provides an accurate depiction of the condition of 19th century Bengal. She stressed on the evil system which robbed childhood out of little girls and transformed girls as young as twelve into mothers before they are physically or mentally ready for it. She writes, 'If child-marriage doesn't continue these girls wouldn't have to face this unbearable pain. Even she who gives birth to sons due to favorable luck can't escape the

danger and be happy, she suffers from Sutika Jwar (Puerperal fever) and bears great pains, or the child being frail and weak increases the suffering of the mother who is too young to raise it properly.[1] Eminent reformers of 19th century Bengal like Dr. Mahendralal Sircar also held a very critical view about this unfortunate custom. He was also of the view that stopping child-marriage would not only enable the girls to enjoy prolonged childhood but also their proper physical and emotional maturation.[2] The life of women in colonial Bengal was a tale of neglect and apathy. This was reflected in women who had weak constitution, poor health and suffered from multitude of diseases like anemia and tuberculosis. Gynecological problems were very common and mostly remained untreated. Under aged motherhood under such conditions deteriorated the state of matters. In traditional society self neglect was considered as a primary attribute of a virtuous wife. Members of the 'antahpur' were denied of proper nutrition, clean air and basic healthcare, either by self-choice or by sheer neglect on the part of her family members. Multiple pregnancies with very little intervals in between added to the severity of the situation. Health experts as well as social thinkers of the colonial period were of the view that death of mothers at childbirth lower than seventeen contributed heavily to the heavily maternal mortality of colonial Bengal.[3]

SECTION-11 [Pregnancy and childbirth]

Diagnosis of pregnancy in those days was usually made by the dais who were the sole caregivers to women in this field. There was a general air of apathy surrounding child birth. This was reflected most accurately in the way the birthing chambers were constructed during the period. Doctor Jadunath Mukherjee, the author of one of the most popular and well-known midwifery manuals of the 19th century provides a very touching and vivid description of the birthing scenario of the period. The problem with aturghar, he writes, is that they are constructed in a place which is extremely dirty and it is built in such a manner that there is no way for light to enter. The floors are so damp, he further writes, that water seeps out of it. In a memorable sentence he says that there is no surprise in the fact that thousands of mothers and babies die in these birthing chambers, what is surprising is that some live.[4] There were hardly any way to protect the mother and the baby from the onslaught of rain, summer and winter and they were practically isolated from the entire family during this crucial period. Several factors were responsible behind the dismal state of the birthing chambers. Most important among them was the prevalent misconception that childbirth was an impure and impious activity and so all articles used in it would be disposable. So the entire room was assembled with base and

1 Kailashbasini Devi, Hindu Mahilaganer Hinabastha, Calcutta 1863, page43

2 Mahendralal Sircar. Earliest Marriageable Age, a reprint from The Calcutta Journal of Medicine. July 1871

3 Gokul Bihari Das, 'Balyabibaha o Akalmrityu', Bharatbarsha, 1925(Year 13,Volume 1), pages 767-776

4 Jadunath Mukherjee, A guide to midwives and mothers written in the form of a dialogue in two papers (Dhatrishiksha o prosutishikshaarthaatkathapokathanchholedai o prosutidigerpratiupadesh, pratham o dwitiyabhag) published by Sanskrit Press Depository, Publication date-February 1887, Edition- 7th, page26.

inferior with base and inferior items which were no longer in use. Moreover decisions regarding the childbirth were usually taken by the senior women of the household, who more often than not tended to assume a conservative stance on the issue. In fact a close study of various sources of 19th as well as first half of 20th century reveals that, in spite of various advancements in the medical field during the first half of twentieth century, this callous and apathetical attitude about birthing chambers largely continued. The following words belong to a writer who described the condition of birthing chambers of Bengal during as late as 1919.

'The aturghar of Bengali people is a much hated place like garbage dumps and latrines. The room which is disgusting, unworthy of human habitation, lacks any source of ventilation, is nearest to the cowshed is the ideal place of child birth in Bengali families. All tattered and filthy pieces of cloth, gunny bags, torn mattresses, old carpets, dirty old quilts blankets are used to make beds for mistresses of the family and its heir. Eating in earthen pots, bearing the pain of continuous hot compressions, inhaling the aroma of the accumulated bloody and soiled clothes in the room, blocking all its airways , the proud Hindu woman lives there with a Chandal and feels thankful about it'.[5]

What surprises us in this case is the striking similarity between the arguments of authors writing in different periods. Apart from the makeshift birthing chambers that were hugely popular among the lower and middle classes owing to their low costs, there were also permanent ones. These were mostly used by the upper classes of the Hindu and Muslim community. Though these were relatively better than the former types which were nothing more than thatched huts made of palm leaves, bamboo, hay and mud, but even they hardly qualified as suitable place of birth. These improperly ventilated, poorly lit, windowless damp structures wrecked havoc on the health of the mother and the newborn. The midwives followed the custom of keeping open fire on one side of the room. This practice was supposed to help in cleaning the air but actually managed to do quite the opposite. Contemporary books and manuals contain a number of reports on death of mothers who were apparently suffocated due to the accumulated Carbon-monoxide gas inside the tiny chamber. The level of knowledge about the true nature of this problem was seriously lacking during the 19th century. Doctor Annada Charan Khastagir, an eminent Homeopathic physician in the second half of 19th century, while writing his book 'AyurBardhan' on various health problems and their cure mentioned about the death of a woman inside the birthing chamber during that year in Calcutta. The death according to him occurred due to the accumulation of 'Carbolic-Acid' gas inside the chamber.[6] This was hardly an isolated event during the period. Lung infections among mother and newborn were quite common and cases of Tuberculosis were pretty high during the period both among women of the Hindu as well as Muslim communities. Doctor Kali Bhusan Mukherjee, the author of 'Matrimangal' a medical drama written under the aegis of the Dufferin Fund to raise the levels of awareness

5 Ramesh Chandra Roy, 'Chelemanush kora', Bharatbarsha, 1919, page 239-245

6 AnnadaCharanKhastagir, 'AyurBardhan', Published by the New School Book Society, Calcutta, Publication date-1883

among common people through the use of popular medium, notes the high rate of Tuberculosis among pregnant women of the Muslim community.[7]

Inside the confines of the birthing chambers the process of childbirth followed a very different route. The word of the dai was supreme and so any mistakes on her part proved to be fatal for the mother as well as the baby. From the very beginning the practitioners of medicine have always stressed on the fact that actual labor began only with the full dilation of the Cervix. But the traditional midwives of the time rarely waited till the full dilation was complete. They made several crude efforts to speed up the process .This undue intervention on their part not only endangered the lives of the mother and the baby but also complicated the process of birth. Right when the mother experienced contractions for the first time, she was made to sit on all fours and push hard. This particular position has been referred to as 'Jaoan'.[8]An author, who was a Kaviraj[9] practicing in the 19th century Bengal wrote that :-

'The custom in which women are made to sit in Jaoan during childbirth that is followed in our country is extremely dangerous. This is why it is better to perform labor in lying position...Everyone should keep in mind that urging the mother to strain before the start of effective labor is immensely harmful. It weakens her and makes her incapable of pushing when it is actually required. Another adverse effect of this practice is that it leads to heavy bleeding that often proves to be fatal for the mother.'[10]

This premature pushing was expected to speed up labor. But it managed to do the quite opposite. Not only did it result in tearing but also paved the way for a host of other complications. Experts like Doctor Jadunath Mukherjee complained that one of the main reasons for mishaps during this period were the fruitless efforts made by the dai to deliver the babies during the first stage of labor. In one part of his book he writes that if the dai managed to refrain from urging the mother to push during the first stage of labor, and if they took care during the examination of the cervix, waters wouldn't break before its time.[11] Some other medical and midwifery texts refer to the same position as 'Jamal'.[12] Rupturing the placenta with nails or other sharp objects was a fairly common practice. The dais of the period also tried to induce vomiting by forcing the mother to swallow her hair. Trained doctors and a limited number of trained midwives of the period also used emetics to accelerate labor. Authors of midwifery manuals like Jadunath Mukherjee and

7 Kali Bhusan Mukherjee. 'Matrimangal(Welfare of the mother)', Published by Bengal Government Press, Calcutta. Publication date-1923, page-23

8 Ayurved mate dhatribidya', BamabodhiniPatrika, Calcutta. Number-376,Publication date-1896. page-19-22

9 The practioners of traditional Indian Medicine or Ayurved were known as Kaviraj

10 Ayurved mate dhatribidya. op.cit. page 19

11 A guide to native midwives and mothers, op.cit, page 63

12 Haranath Sharma . 'DhatriShikshaSarngraha' Published by Bengal Report Press, Calcutta. Publication date- 11th June. 1887. page-64.(The author was a doctor by profession and a product of western medical learning. His book is an interesting blend of western and traditional medical practices. But he was more influenced by the former than the latter.

Devendranath Roy[13] mention the use of herbal medicines like 'ipecacuanha'[14] But the knowledge about these medicines was restricted to a limited number of people and so the common women giving birth inside the tiny rooms all over Bengal were yet to enjoy their benefits.

Birth usually took place in Jaoan or Jamal position where the woman giving birth would support herself on her hands and knees and someone would hold her head while the dai would sit in the rear for birthing the baby. But we also find the mention of the horizontal lying position, also referred as 'Cheer in some other sources like that of Jadunath Mukherjee.[15] Both these positions put added pressure on the perineum .In fact injuries of the perineum was a very common occurrence in the case of first time mothers.[16] The entrance of the fetal head into the birth canal caused medium to deep lacerations in the perineum and pelvic floor muscles. The situation was worsened by the daiwho resorted to crude pulling and pushing caused serious injuries to the area. This practice of rough pulling of the fetal head often led to fatal injuries to the 'Medulla Oblongata'[17] of the newborn, a fact that is corroborated by many experts of the period.

The third stage of the labor which started with the birth of the baby and ended with the expulsion of the placenta was undoubtedly the most crucial phase. It was when maximum fatality happened and any foliy on the part of the birth attendant proved disastrous for the mother. Traditional customs forbade the cutting of the cord till the placenta was delivered.[18] The most common item used for this purpose was a thinly cut bamboo strip, colloquially referred to as chachari .Scissors were rarely used although traditional Indian medicine of Caraka advised the used of sharpened tools made of gold, silver or iron.[19] The reason behind the use of the bamboo strips was their ready availability. With the turn of the century and increase in the number of trained medical personnel, the use of scissors increased. Even then the use of unsterilized scissors continued to cause harm. The use ofchachari was continued even in the next century by a large section of people who still clung to the traditional delivery method at the hands of the dai. A ' lady writing about the state of pregnant women in her times writes the following words,

'It is possible that in those days unavailability of scissors prompted people to use Chachari. Today there is no dearth of scissors. Still they

13 Devendranath Roy was the author of an well known midwifery manual of the period. It was titled 'Garhastya swasthyaraksha ebong sachitra dhatrishiksha, i.e. Domestic Hygiene and guide to Bengali midwives'. It was published in the year 1904 and received moderate reviews from Bharati . an immensely popular Bengali journal of colonial period.

14 A flowering plant Psycholriya ipecacuanha, the root of which had medicinal properties. It was used as an emetic i.e. an agent that induces nausea and vomiting to quicken labor.

15 A guide to native midwives and mothers, op.cit, page 63

16 Dhatrishikshasamgraha. op.cit. page 229

17 The Medulla Oblongata is a portion of the hind brain which controls autonomic functions such as breathing, heart beat and digestion.

18 Dhatrishikshasamgraha, op.cit, page 67

19 Ayurvedmatedhatribidya, op.cit, page 20

are used in some houses...In those days the Chachari was freshly collected from the tree. Now it is stored from beforehand and collects dirt. We don't even realize how the unclean Chachari and unsterilized scissors spread the seeds of tetanus into the body of the child.'[20]

Very crude techniques were used in case of the expulsion of the placenta. Just as the first stage of labor when the dai exhibited extreme impatience to wait for full dilation, the same impatience was reflected when the time came to wait for the natural expulsion of the placenta. They inserted their hands and made attempts for expel the placenta manually. This action had disastrous consequences and undoubtedly paved the path for various infections. The custom of pulling out the placenta by hands was very wide spread in the 19th century Bengal. Medical experts throughout ages have emphasized the necessity of waiting till the placenta detaches itself from the uterine wall. But this knowledge was limited to very few people. For most others the expulsion

The traditional midwives of the 19th century had a very different view about nutritional needs of a new mother. Milk and any other types of liquid diet were of the placenta signified the end of the 'impure' process of childbirth and they hardly bothered about the way it was delivered Jadunath Mukherjee. in his famous midwifery manual, pointed out that the dai pulled out the placenta with bare hands because of the family members of the mother who wanted to see it delivered in any way. [21] The society was more concerned about the ritualistic significance of the expulsion. The end of this phase called for obligatory penances on the part of the family members. It also signaled the start of the 'atur' phase in which the mother would be quarantined from the rest of her family for a considerable time. A woman going through the 'atur' phase was considered desecrated by the process of birth and she would again have to go through penances to become 'chaste' and 'suitable' for her family. Some sources of 19th century point to the use of Ergot of Rye by some doctors as well as trained midwives of the period for this purpose.[22] [This compound contains a group of alkaloids that in controlled dosages have special medicinal value in stopping blood flow, in postpartitive contraction of the uterus after childbirth]. The incomplete expulsion of the placenta resulted in retention of placental tissue by the uterus thereby causing atony.[23] [Uterine atony is a medical condition which results in loss of muscle tone in uterine musculature thereby preventing contraction of uterine muscles and can cause acute hemorrhage].

It is not at all surprising that the most dreadful diseases of women occurred within a week of childbirth. Some of the most common and deadly diseases that contributed to the high maternal mortality rates of the period were Septicemia (colloquially known as Putijwar).

20 Manorama Ghosh , 'Ay DesherProsuti', MasikBasumati 1922, Year 1, Volume 1, page 331-333

21 A guide to native midwives and mothers, op. cit, page 79

22 Khirodprasad Chattopadhyay, Dhatribidya(tr), Published by Oriental Press ,Calcutta, Publication date 1886, page 152 (This book is another example of medical literature of the 191 century produced by medical practitioners of the period.).

23 For results of retention of placental tissue see Charles. R. B. Beckmann(Ed), 'Obstetrics and Gynecology' Published By Lippincott Williams &Williams , Publication date May 6, 2009. Edition-Sixth

Puerperal fever (colloquially known as Sutika jwar) and Pyemia(colloquially known as Sapuj jwar) . Though they were often brought under the all encompassing name of 'Childbed fever', their natures were largely varied. But the common factor was that they attacked in the immediate post natal stage when the placental site was a large open wound that was easily invaded by bacteria. Level of knowledge about these diseases was still very low. The medical community of the west itself was divided about whether the puerperal fever was essentially putrid or inflammatory in nature.[24] The contagious nature of the disease was slowly coming to light. The new knowledge was reflected in the medical treatises and midwifery manuals written in Bengal during the second half of 19th century. Devendranath Roy, author of a popular midwifery manual of 19th century described the puerperal fever in the following words. 'The fever originates from a special poison. It enters the uterus of the woman during or after labor when the cord-site is not properly healed. It is so small that it cannot be seen with naked eyes. It can only be seen under microscope. It is so small that it goes with the ' air, our hands, clothes worn by the pregnant woman and by other ways.'(Translated)[25]

The methods of childbirth in 19th century Bengal was so unscientific and 'brutal' that it made injury and infections inevitable. These injuries on their part set up a chain reaction that ultimately led to Puerperal fever. The practice of manual separation of the placenta that was followed during the period almost always resulted in retention of parts of the placenta inside the uterus. This prevented the natural process of contraction of the uterus and caused heavy hemorrhage. [26] Ironically, in traditional midwifery heavy bleeding after childbirth was considered an essential part of labor. Doctor Jadunath Mukherjee, in his book goes on to describe how in 19th century, mothers were made to stand or sit up, immediately after labor to enable the flow of 'polluted blood'.[27] The level of awareness about child birth related complications was so shallow that a serious complication born of a mistake was seen as an essential 'law'.

Septicemia is poisoning from putrefaction. The minor tears and injuries during childbirth regularly got infected and led to retention of putrid fluids. When the poisoning was intense, it overwhelmed the patients and death occurred within a very short time. The inflammation of the wounds inflicted on women during labor was the main factor behind these deaths. The role of third party behind the infection of childbirth wounds was unanimously agreed upon by medical experts as well as social thinkers of the time. The dais were notorious for their disregard of hygiene. But this disregard was borne out of their extreme poverty more than anything else. This poverty bred ignorance and an extreme reluctance towards change. They hailed from the poorest sections of the society and belonged to the castes placed at the bottom of the social hierarchy in colonial Bengal. They earned very

24 Christine Hallett,' The attempt to understand Puerperal Fever in the eighteenth and early nineteenth century: the influence of the Inflammation Theory', Medical History, 2005,49: Pages 1-28

25 Domestic hygiene and guide to Bengali midwives, op. cit, page 143-144

26 Dhatrishiksha Samgraha, op. cit, page 203

27 A guide to native midwives and mothers , op. cit, page 99

meager amounts for their job and so cleanliness was a novelty they couldn't afford. They offered their services for rates as small as half a shika [a coin valuing a quarter of a rupee, a four anna bit]. At best, the remuneration of a dai in 19th century Bengal consisted of an old sari and a sidha , a small tray of some uncooked food items.[28] Infections and germs were utterly alien concepts to them. As a result they handled several cases at the same time and in the same outfit, thereby unknowingly becoming carriers of deadly pathogens. Their ignorance affected the health of mothers and babies not only in various stages of childbirth but also in the post-natal period.

Their examination of the cervix with bare and unwashed hands promoted infections. After the birth they followed the practice of cleaning the birth canal, for which they often used pieces of cloth that they had previously used on some other patients.[29] They were the most potent carriers of germs from one woman to the next. The presence of parts of the placenta in the uterus and child birth related injuries combined with the 'third-party' infections led to devastating results. Pyemia was a form of Septicemia marked by formation of numerous purulent deposits all over the body of the patient. Colloquially referred to as Sapuj jwar, it was a very common complication suffered by women giving birth in colonial Bengal. Pyemic abcesses differed from ordinary abcesses not only in the character of their pus but also with the rapidity of their growth.[30] Apart from the midwives, health professionals like doctors were also responsible for spreading the disease. The female wards of the lying in hospitals were the hotbeds for virulent diseases like Puerperal fever, Pyemia and Septicemia. They fell under a specific category referred by experts as 'Zymotic Diseases'.[31] Septicemia was considered a Zymotic disease in the 19th century by health experts of the time.'[32] In hospitals quality of surgery and post-operative treatment was very low. Operations often led to patient deaths from infections of Septicemia and Pyemia. Some modern scholars point out that around 1880 Listerian antisepsis was gradually introduced into obstetrics, which greatly reduced the maternal mortality rates in maternity hospitals in the west.[33] In fact introduction of Listerian antiseptics in dressing of childbirth wounds in the major medical institutions of Calcutta went a long way in reducing maternal mortality rates among women admitted in surgery and midwifery sections . In his report on the state of medical institutions in Calcutta during 1879, Dr Joseph Ewart, erstwhile Professor of Physiology in the Medical College, noted that full and successful operation of the Listerian antiseptic

28 Domestic hygiene and guide to Bengali midwives, op.cit, page!45

29 Dhatribidya, op.cit, page 351

30John Eric Erichson ,The Science and art of surgery: Being a treatise on surgical injuries, diseases and operations Walton &Maberly, 1853, Page 363

31 Zymotic Disease(for the Greek language term zumoun for "ferment"), an obsolete term in medicine , formerly applied to the class of acute infectious maladies presumed to be due to some virus or organism which acts in the system like a ferment.

32 A L Galabin, 'The Hunterion Oration on the etiology of puerperal fever' , British Medical Journal. April 1887 Pages 919 to 925

33 I London, Death in childbirth, Oxford :Clarendon Press, 1992

system along with use of better drugs and instruments contributed greatly in reducing maternal mortality rates in surgical and midwifery sections of the hospitals.[34] But women in hospitals constituted only a minuscule part of the total population. The real picture in the vast regions of Bengal was very dim indeed. Women outside the confines of the hospitals were yet to enjoy the benefits of modern medicine. Apart from these major complications afflicting women, contemporary sources also point towards some other disorders that plagued women in the first few weeks after childbirth. One disorder that has been frequently mentioned is Secondary Puerperal Hemorrhage. It occurred in women in the first or second week after childbirth causing massive hemorrhage. The inflammations of the wounds in the uterine region along with the inadequate contraction of the uterus due to presence of the parts decomposing placenta were the primary causes behind it.[35] Writing about it the author of a midwifery manual pointed out that it attacked suddenly when no one but the dai would be present beside the bedside of the mother and claimed numerous lives especially in the countryside where trained medical personnel was unavailable.[36] Another disorder that occurred frequently among pregnant women both before and after childbirth was Eclampsia. There were various theories about the causations of the disease during the 18th and 19th century. Towards the end of the 19th century physicians were gradually getting aware that the convulsions that were characteristic to the disease were caused by factors like edema, proteinuria and therefore shouldn't be confused with epileptic seizures.[37] But in 19th century Bengal, the disease was confused with hysteria and epilepsy. Among the lower sections of the society, eclamptic seizures was thought to be caused by demonic o possessions and people often resorted to the Ojha (a traditional healer or an exorcist) for cure. These seizures were a very common occurrence among pregnant women of the period and attests to the poor pre-natal and post-natal of mothers during that time. Women who had given birth multiple times also suffered from injuries related to tearing of the uterus and the cervix.[38]

SECTION-III [Confinement inside the Aturghar}

The time spent by a woman inside the birthing chamber following childbirth was extremely crucial for both the mother and the baby. Theoretically this was supposed to be a healing period for the mother away from the drudgeries of domestic life. But the conditions of the birthing chamber as well as the quality of

34 Report from Joseph Ewart (Esq., MD, Deputy Surgeon General(Retired), late Superintendent of and Surgeon to the European General Hospital, Professor of Physiology in the Medical College, Presidency Surgeon and President of the Snake Poison Commission , Calcutta) to the Secretary to the Government of Bengal, Judicial and Political Departments, dated Montpelier Hall, Brighton, November 19.1880 [Report on Calcutta Medical Institutions, Medical Branch, Municipal Department, April 1880, Annexurel]

35 Dhatrishiksha Samgraha, op. cit, page 215

36 ibid, page 218

37 Mandy J Bell,' A historical overview of Preeclampsia-Eclampsia', Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing , 2010 September; 39(5): page 510-518

38 Dhatrishiksha Samgraha, op.cit, page 230

the post-natal care made convalescence a very daunting possibility. The believed to cause infections.[39] Therefore women who had just given birth were refrained from having foods that were actually beneficial in their state. On the other hand spicy foods laden with chilies. pepper and ghee (purified butter) were considered helpful in the recovery from childbirth wounds and childbed fever. As a result postpartum diarrhea and dysentery was a common occurrence in the birthing chamber. The lack of proper nutrition proved as an obstruction in their recovery and had an adverse effect on the health of the newborn that solely depended on the mother for survival. Another common practice that was observed inside the birthing chamber was that of treating the mother and the baby with hot compressions. Both the woman and her new born had to suffer rigorous hot compressions throughout the day. In fact the open fires that were a common feature of the birthing chambers of Bengal during the 19th century were maintained with the dual purpose of 'purifying' the air and providing hot compressions to the invalids. Jadunath Mukherjee in his book wrote about the irony of these compressions which according to him succeeded in nothing but burning up the mother and her new born.[40]

The period of confinement following childbirth varied throughout the 19th century. Traditional customs advised an eight day healing period following childbirth. But during the second half of the 19th century various sources point out towards a gradual reduction of this eight day phase. Due to increasing popularity of a custom called 'Harir loof these eight days were sometimes reduced to one or two. By this custom, minor offerings to God Hari hastened the process of purification of the new mother and enabled her quick return to family life. The chief reason behind its popularity was that it helped in cutting the costs of the birthing chamber. By enabling a quick return of the new mother to the family life it also saved labour charges. Doctor Kalikrishna Mitra, a renowned Homeopathic physician of the late 19th century commented in his book Garhastya Byabastha that the custom of Harir Loot served as a boon for women. It hastened the lengthy purification process and enabled the mothers to escape the horrors of the birthing chambers.41But at the same time this custom shortened the healing period for the mother who was made to return to the menial tasks of daily life in her delicate condition. Sometimes people took advantages of this custom and new mothers were forced to return to family life within a single day. We find references of how women who had just been through labor were given a 'purifying bath' by the dai and her family members and forced to return to her daily life.[42] This practice in a way robbed the women of precious rest which was otherwise elusive to them. The reduction of the healing period also increased the chances of multiple pregnancies within a very short span of time. The risk of maternal deaths during childbirth was multiplied as new 'birth' injuries were added to the previously unhealed ones. These anemic ill fed women entered a vicious cycle with no means to escape.

39 A guide to native midwives and mothers, op.cit, page102

40 ibid

41 KalikrishnaMitra, GarhastyaByabastha, Published by Haniman Home, Calcutta, 1896, Edition-2nd

42 A guide to native midwives and mothers, op.cit, page 104

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে কলেজের এন.সি.সি. ও এন.এস.এস. বিভাগ

দিশারী

শান্তিনিকেতন ভ্রমণে বাংলা বিভাগ

কলেজে সরস্বতী পূজো—২০১৭

ছাত্র সংসদের সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক (জি.এস.)

১৫ই আগষ্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে সভাপতি, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

সি.বি.সি.এস. সেমিনারে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি